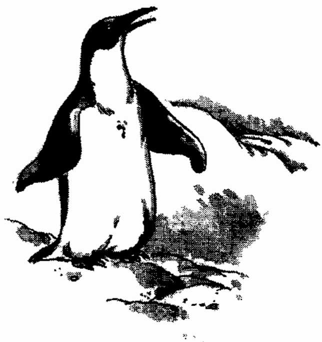
অনীশ দেব

হিমশীতল



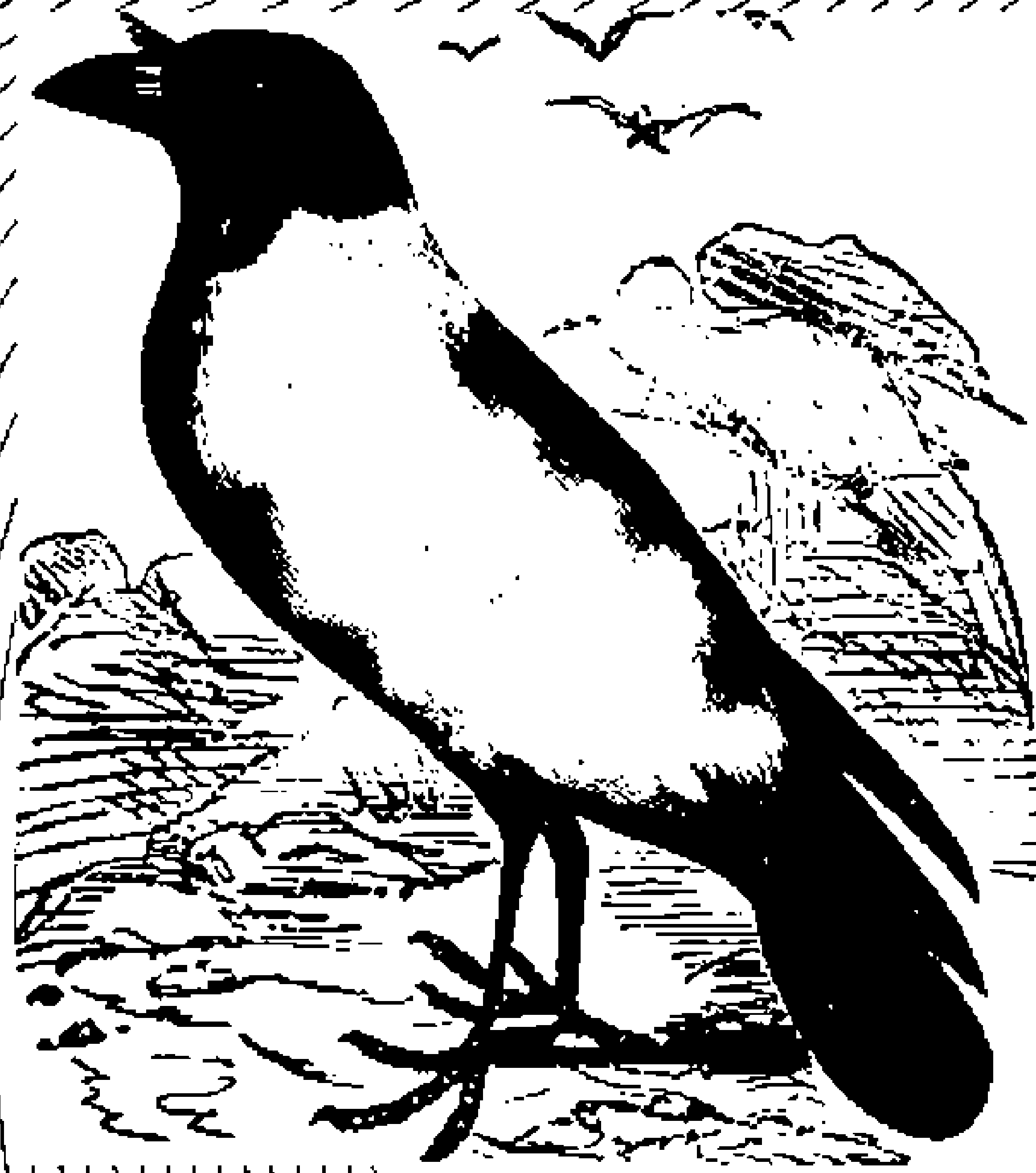
অনীশ দেব

হিমশীতল



পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২
ই-মেল : patrabha@vsnl.net

Corvas



Who is Pintu Das

The social Sweeper

A member of
www.pathagar.net

we are formerly know as
www.boirboi.net

'কিশোর ভারতী' পত্রিকার ২০০২ সালের পুজো সংখ্যায় এই উপন্যাসটির প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়। সেটাকে ঘষা-মাজা করে, কিছু সংযোজন করে, বই হিসেবে প্রকাশ করা হল। এই লেখাটির রসদ জোগাড় করতে বেশ কয়েকটি বিদেশি বই ও রচনার সাহায্য নিয়েছি। আর একমাত্র বাংলা বই—সুদীপ্তা সেনগুপ্তের 'আন্টার্কটিকা'—আমার ভীষণ কাজে লেগেছে।

অনীশ দেব

এক

কোথাও যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়েছে সেটা বোঝা গেল উকিলসাহেবকে দেখে।

দু-আড়াই বছরের বাচ্চা ছেলের মতো থপথপ করে পা ফেলে ও এসে হাজির হল আমার কাছে। মুখ আকাশের দিকে তুলে বিচিত্র কাঁদুনি গোছের আওয়াজ করে ডাক ছাড়ল কয়েকবার। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

আমরা আন্টার্কটিকায় এসে আস্তানা গাড়ার কয়েকদিন পর থেকেই এই অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটা আমাদের এলাকায় ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে। ওর গায়ে শক্ত আঁশের মতো পালক—সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। পিঠ আর ডানার রং কালো, তবে বুকের দিকটা ধবধবে সাদা। হঠাৎ করে মনে হতে পারে কালো কোট পরা কোনও উকিল বুঝি। সেইজন্যেই আমি ওর নাম রেখেছি 'উকিলসাহেব'।

আন্টার্কটিকায় সতেরো রকম প্রজাতির পেঙ্গুইন পাওয়া গেলেও অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের দেখা মেলে বেশি। এই অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটাকে কোনও এক সময়ে একটা লেপার্ড সিল আক্রমণ করেছিল—কিন্তু খতম করতে পারেনি। সেই আক্রমণের চিহ্ন হিসেবে ওর বুকের ওপর দিকটায় একটা ক্ষতচিহ্ন থেকে গেছে—জায়গাটায় ঠিকমতো পালক গজায়নি। সেই দাগ দেখেই ওকে আমি চট করে চিনতে পারি। একটু আগেই ওকে একজন সঙ্গী নিয়ে এদিকটায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলাম। কিন্তু এখন ও একা।

উকিলসাহেবের উচ্চতা বড়জোর দু-ফুট, কিন্তু হাঁটাচলা বেশ গুরুগম্ভীর। এমনিতে ওর খাদ্য ক্রিল—আন্টার্কটিকার খুদে চিংড়ি। তবে আমাদের ক্যাম্পের কাছে ঘোরাঘুরির সময় দেখেছি টিনের কৌটো-বন্দি মাছের দু-একটুকরো দিলে দিব্যি খেয়ে নেয়।

এখন ওকে দেখে মজা পাওয়ার বদলে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

কারণ, ওর সাদা পালকের ওপরে চুনির দানার মতো বেশ কয়েক বিন্দু রক্ত লেগে রয়েছে। এই প্রবল শীতে—সাবজিরো উষ্ণতায়—রক্তের ছিটে ওর গায়ে লাগার পরই জমাট বেঁধে গেছে।

কিন্তু উকিলসাহেবের গায়ে রক্ত এল কোথা থেকে?

পেঙ্গুইনরা নিজেদের মধ্যে বিকট ঝগড়া করে বটে, কিন্তু রক্তারক্তি? নাঃ, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হচ্ছে।

আমি উকিলসাহেবকে 'তু-তু' করে আরও কাছে ডাকলাম। ও সে-ডাকে ভ্রূক্ষেপ না করে দাঁড়িয়েই রইল। তখন আমি খুব ধীরে-ধীরে ওর দিকে দু-পা এগিয়ে হাত বাড়ালাম—গ্লাভ্স পরা আঙুলের ডগায় কয়েকটা চুনির দানাকে স্পর্শ করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দানাগুলো খসে পড়ল বরফের ওপরে। আর উকিলসাহেব কী ভেবে কয়েক পা দূরে সরে গেল।

আমি বরফের ওপরে উবু হয়ে বসে পড়লাম। জমাট বাঁধা রক্তের ফোঁটাগুলো দু-আঙুলের ডগায় তুলে নিলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নজর চালালাম ক্যাম্পের দিকে।

মাত্র পঁচিশ-তিরিশ মিটার দূরেই আমাদের ক্যাম্প 'এক্স স্টেশন'। ক্যাম্পের বাইরে দুজন লোক কী একটা যন্ত্র নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে। অনুমানে মনে হল চন্দ্রেশ্বর গুপ্তা আর রোহিত চিরিমার।

আমি চেঁচিয়ে ওদের ডাকলাম।

আন্টার্কটিকার বাতাস ভারি হওয়ার জন্যে শব্দ খুব স্পষ্টভাবে শোনা যায়। ওরা আমার ডাক শুনতে পেল। আমার দিকে একপলক তাকিয়ে হাতের যন্ত্রটা রেখে দিল বরফের ওপরে। তারপর পা বাড়াল।

কাছে আসতেই দেখলাম, ঠিকই ধরেছি—চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত। চন্দ্রেশ্বর আমাদের রিসার্চ টিমের জিওলজিস্ট—মানে, ভূতত্ত্ববিদ। আর রোহিত হল আর্মির লোক—বরফ বিশেষজ্ঞ।

এবারের অভিযানে রোহিত চিরিমারের ভূমিকা খুব জরুরি। কারণ, গত তিন বছর ধরে আন্টার্কটিকায় 'পোল অফ ইনঅ্যাক্সেসিবিলিটি'-র কাছাকাছি যে বরফ ড্রিলিং-এর কাজ চলছে, এবারের অভিযানে সেটা শেষ হবে। প্রায় চারহাজার মিটার পুরু বরফের স্তর ভেদ করে আমরা পৌঁছে যাব—অথবা, বলা ভালো আমাদের যন্ত্র পৌঁছে যাবে—'লেক এক্স'-এর রহস্যময় জলে।



রোহিত আর চন্দ্রেশ্বর আমার কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই আমি আঙুল তুলে অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটার দিকে দেখালাম।

উকিলসাহেবের বুকের দিকে তাকিয়েই ওরা বুঝতে পারল আমি কী বলতে চাইছি। রোহিত পাখিটার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল। চোখ সরু করে ওটার বুকের লাল দাগগুলো দেখতে লাগল।

আমি বললাম, 'রোহিত, এই যে—আমার কাছে কয়েকটা স্যাম্প্‌ল আছে...।'

আমার গ্লাভ্‌স পরা হাতের তালুতে রক্তের দানাগুলো বলতে গেলে চোখে পড়ে-কি-পড়ে-না।

চন্দ্রেশ্বর আমার হাতের ওপরে ঝুঁকে পড়ল ঃ 'ইট্‌স ব্লাড, বস!'

'হ্যাঁ—রক্ত। জমাট বেঁধে গেছে।'

রোহিতও ঝুঁকে পড়ল ছোট্ট লাল বিন্দুগুলোর ওপরে ঃ 'কীসের রক্ত, দাদা?'

চন্দ্রেশ্বর বলল, 'পেঙ্গুইনরা নিজেদের মধ্যে ইউসুয়ালি রক্তারক্তি কাণ্ড বাধায় না। তা ছাড়া, এই পেঙ্গুইনটা উন্ডেড বলেও মনে হচ্ছে না...।'

আমরা যে-কথাটা উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছিলাম, রোহিত সে-কথাটা উচ্চারণ করে বসল, 'মানুষের রক্ত নাকি, দাদা?'

'তুমি ঠিক পয়েন্টে হিট করেছ, রোহিত। আমি শিওর হতে চাই যে, এটা মানুষের রক্ত নয়। আর, আরও শিওর হতে চাই যে, এটা আমাদের কারও রক্ত নয়...।'

'ও মাই গড!' আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই চাপা গলায় বলে উঠেছে চন্দ্রেশ্বর গুপ্তা, 'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। এখুনি ক্যাম্পে চলো—খোঁজ করে দেখি সবাই বহাল তবিয়তে আছে কি না। এখানে আমরা তিনজন—বাকি রইল আর চারজন। দেখি ওরা কে কোথায় আছে...।'

রক্তের দানাগুলো পলিথিনের একটা স্যাম্প্‌ল-ব্যাগে ঢুকিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রাখলাম। তারপর আমরা তিনজনে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পের দিকে হেঁটে চললাম। আর উকিলসাহেবও থপথপ করে একটা বরফের ঢালের দিকে এগিয়ে চলল। ওদিকে কিলোমিটারখানেক এগোলেই ও ওর 'রুকারি'-তে পৌঁছে যাবে।

পেঙ্গুইনদের আস্তানা বা বাসস্থানকে বলে রুকারি। প্রায় বছরদশেক ধরে আমেরিকা, ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলে পেঙ্গুইন নিয়ে বিশেষ ধরনের গবেষণা চালাচ্ছে। ওরাই যৌথ প্রচেষ্টায় বহু টাকা খরচ করে পোল অফ ইনঅ্যাক্সেসিবিলিটিতে এই কৃত্রিম পেঙ্গুইন রুকারি তৈরি করেছে। বরফ গলিয়ে গর্ত তৈরি করে তার মধ্যে পাথর ফেলে গড়ে তোলা হয়েছে একটা বিশাল হ্রদ। হ্রদের পাড়ে অনেকখানি পাথুরে জায়গা। আর হ্রদের জলে নুন মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে নোনা জল। সেই জলে চাষ করা হচ্ছে পেঙ্গুইনদের প্রধান খাদ্য ক্রিল—আন্টার্কটিকার বিশেষ প্রজাতির চিংড়ি।

ওই রুকারি থেকেই উকিলসাহেব কিংবা তার দু-চারজন জাতভাই আমাদের ক্যাম্পের কাছে ঘোরাঘুরি করতে আসে।

আমরা যে-অভিযানের দায়িত্ব নিয়ে এবারে আন্টার্কটিকায় এসেছি তাতে রক্তপাতের কোনও সিন নেই। তাই এই রক্তপাতের ঘটনাটা আমাকে বেশ ধাক্কা দিয়েছে।

রোহিত কী ভেবে বলল, 'সুজাতা পেঙ্গুইন নিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করছে না তো?'

আমি ওর দিকে তাকালাম। গগল্স-এর গাঢ় রঙের কাচে আন্টার্কটিকার ধু-ধু বরফ-ঢাকা প্রান্তরের ছায়া। রোহিতের চোখ দেখা যাচ্ছে না। সারা শরীর হলুদ রঙের ভারি জ্যাকেটে ঢাকা। মাথায় হলুদ টুপি। লালচে ঠোঁটের ওপরে ঝাঁটার মতো গোঁফ। গোঁফটা আর্মির প্রতীক হলেও হতে পারে। তবে আন্টার্কটিকায় এসে প্রত্যেকেরই গোঁফ আমার খুব কাজে লেগেছে। সুকুমার রায় ঠিকই বলেছিলেন : গোঁফ দিয়ে যায় চেনা। কারণ, সারা শরীর শীতের পোশাকে ঢেকে চোখে জাম্বো গগল্স পরে পুরুষগুলো যখন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় তখন গোঁফ দেখেই আমি তাদের চিনে নিতে পারি।

রোহিতের কথার জবাবে আমি বললাম, 'তুমি তো ভালো করেই জানো রোহিত, এখানে আমাদের পেঙ্গুইন নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের কোনও প্রোগ্রাম নেই। থাকলে টিম লিডার হিসেবে সেটা আমি জানতাম।'

রোহিত ঘাড় নাড়ল।

চন্দ্রেশ্বর বলল, 'আমাদের কেউ তা হলে উন্মাদ হয়েছে।'

'হতে পারে। কিন্তু পেঙ্গুইনটার সামনে কীভাবে উন্ডেড হল সেটাই ভাবছি...।' আমি বললাম, 'এখন আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় শেষের দিকে। এখন যদি কোনও ঝামেলা হয় তা হলে লেক এক্স-এর জল নিয়ে রিসার্চের প্ল্যান একেবারে ওলটপালট হয়ে যাবে।'

আন্টার্কটিকার চারপাশের সমুদ্রতট থেকে যে-অঞ্চলটি সবচেয়ে দূরে, তারই নাম 'পোল অফ ইনঅ্যাক্সেসিবিলিটি'। বৃত্তের কেন্দ্র যেমন পরিধি থেকে সবচেয়ে দূরের বিন্দু, অনেকটা সেইরকম। এই অঞ্চলের গভীরে বরফ আর পাথরের স্তরের মাঝে খুঁজে পাওয়া লেক এক্স সত্যিই এক রহস্যময় হ্রদ। হিসেব করে যা দেখেছি তাতে অনায়াসে বলা যায়, লেক এক্স রয়েছে সমুদ্রতলেরও কয়েকশো মিটার নিচে। এই হ্রদের জল কেউ কখনও চোখে দেখেনি, কেউ জানে না কোন রহস্যময় প্রাণিজগৎ বেঁচে রয়েছে সেই লুকোনো হ্রদে। হয়তো এই হ্রদের জল থেকেই পাওয়া যাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নতুন ইতিহাস। নতুন কোনও জীবন্ত প্রমাণ খুঁজে পাব আমরা।

এই লেকটার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বেশ আকস্মিকভাবেই।

বছরচারেক আগে আন্টার্কটিকায় রাশিয়া ও ভারতের একটি যৌথ অভিযান হয়েছিল। অভিযানের লক্ষ্য ছিল কুমেরু মহাদেশের পোল অফ ইনঅ্যাক্সেসিবিলিটি অঞ্চলে বরফের স্তরের গভীরতা মাপা, ওই অঞ্চলের অতীত আবহাওয়ার খোঁজখবর করা, এবং সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান করা।

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, কারণ আন্টার্কটিকায় বরফের স্তর অস্বাভাবিকরকম পুরু। পৃথিবীর মিষ্টিজলের শতকরা পঁচাত্তরভাগই এখানে জমে বরফ হয়ে আছে। আর বরফ রয়েছে পৃথিবীর মোট বরফের শতকরা নব্বই ভাগ। এখানকার বরফের গভীরতা কোথাও-কোথাও প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের কাছাকাছি! তবে গড় গভীরতা আড়াই কিলোমিটার। আর আন্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রে বরফের আয়তন প্রায় ঊনতিরিশ মিলিয়ন ঘন কিলোমিটার। এই বিশাল হিমবাহের ওজনে কুমেরু অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ প্রায় ছ'শো মিটার নিচে নেমে গেছে। যদি কোনওভাবে এই বরফকে গলিয়ে ফেলা যায়, তা হলে সারা পৃথিবীর সমুদ্রতল ষাট মিটার উঁচু হয়ে যাবে—ফলে বেশিরভাগ বন্দরই জলে ডুবে যাবে।

আমাদের এই প্রকল্পের কাজ যখন শুরু হয় তখন পর্যন্ত বরফস্তরে ড্রিল করা হয়েছে মোটামুটিভাবে দু-কিলোমিটার পর্যন্ত। ব্রিটিশ ও মার্কিন গবেষক দল এই ড্রিলিং-এর কাজ চালিয়েছিল। কিন্তু বরফের নিচে লুকিয়ে থাকা কোনও হ্রদের সন্ধান তারা পেয়েছে বলে শোনা যায়নি।

দু-বছর আগে ভারত যে-অভিযান চালায় তাতেই প্রথম একটি লেকের অস্তিত্ব আঁচ করেছিল অভিযাত্রীরা। নানান জায়গায় বরফে ড্রিল করে তারপর 'সিজ্‌মিক শট'-এর মাধ্যমে তারা 'ডেপ্‌থ সাউন্ডিং'-এর কাজ চালাচ্ছিল। আন্টার্কটিকার গভীর স্তর থেকে সেইসব বিস্ফোরণের শব্দের প্রতিফলন ধরা পড়ছিল সূক্ষ্ম যন্ত্রে। তা থেকেই বিজ্ঞানীরা বরফের নিচে লুকিয়ে থাকা 'বেডরক'-এর স্তরের খোঁজ পাচ্ছিল।

এইভাবে কাজ চালাতে-চালাতে প্রায় তিনহাজার সাতশো মিটার গভীরতায় একটি জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষণায় এও বোঝা যায়, হ্রদটির আয়তন প্রায় দশহাজার বর্গ কিলোমিটার। তখন এই অজানা হ্রদের নাম দেওয়া হয় 'লেক এক্স'।

এর পরের অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন লেক এক্স'। আর উদ্দেশ্য ছিল বরফে ড্রিল করে লেক এক্স-এর জলে পৌঁছনো। বলতে বাধা নেই, আমাদের কাজটা ড্রিলিং-এর হলেও তার আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখার নির্দেশ আছে। তাই অন্যান্য দেশের অভিযাত্রীরা জানে আমরা সাধারণ ড্রিলিং করে গবেষণার খোরাক খুঁজছি।

পোল অফ ইনঅ্যাক্‌সেসিবিলিটি অঞ্চলে রাশিয়ার গবেষক দল কাজ করছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে। আন্টার্কটিকার অতীতকালের আবহাওয়ার খবর পাওয়ার জন্যে বরফের বিভিন্ন স্তরের ফাঁকে আটকে থাকা গ্যাসের বিশ্লেষণ খুব জরুরি। রাশিয়ানরা মূলত সেই গবেষণাই করছিল, আর তার পাশাপাশি চলছিল খনিজের সন্ধান। আমাদের ধারণা, কোনও লেকের সন্ধান ওরাও আজ পর্যন্ত পায়নি।

আমরা যখন এই লেকের সন্ধান পেলাম তখন প্রথম প্রশ্ন হল, প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর ধরে যে-লেক 'স্টেরাইল' অবস্থায় পড়ে আছে, তাকে হঠাৎ করে এখনকার আবহাওয়ার ছোঁয়াচ লাগতে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না। আবার বিপরীত প্রশ্নটাও বেশ জটিল ছিল ঃ যদি কোনও প্রাগৈতিহাসিক জলচর প্রাণী ওই হ্রদে থেকে থাকে তা হলে তাদের বন্দিদশা

থেকে মুক্তি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না।

যাই হোক, বহু বাকবিতণ্ডার পর, সংসদে বহু উত্তপ্ত চাপান-উতোরের পর বিজ্ঞানের জয় হয়েছিল। সবাই একমত হয়ে বলেছিল যে, বিপদ যা আসে আসুক, বরফের গভীরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোটাই বড় কথা।

তারপর থেকে আমরা একটানা এই গর্ত খোঁড়ার কাজ করে যাচ্ছি। এবং সেই কাজ এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে।

এবারের অভিযানে আমি দলনেতা। তবে রোহিত চিরিমার অপারেশন লেক এক্স-এর শুরু থেকে আছে—তার আগেও দুবার ও এই হিমশীতল অঞ্চলে ড্রিলিং অপারেশনের দায়িত্বে ছিল। ফলে অভিজ্ঞতা ওর বেশি। সেইজন্যেই ওর মতামতকে আমি বেশ গুরুত্ব দিই। আর সেটা রোহিত জানে।

ভারি বুট দিয়ে বরফ মাড়িয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ক্যাম্পের কাছে।

অ্যালুমিনিয়াম আর কাঠ দিয়ে তৈরি আমাদের মূল শিবির। এ ছাড়া দরকার মতো অস্থায়ী শিবিরের জন্যে ব্রিটিশ আন্টার্কটিক সার্ভে থেকে আমরা লাল রঙের পিরামিডের চেহারার কয়েকটা তাঁবু কিনে এনেছি। এই তাঁবুগুলো ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার গতিবেগ পর্যন্ত তুষারঝড় সইতে পারে। শ'দেড়েক মিটার দূরে সেরকম একটা শিবির চোখে পড়ছে। ওটা আমাদের দলের মাইক্রোবায়োলজিস্ট অদিতি প্রধানের গবেষণাগার। ড্রিলিং অপারেশনে যে-বরফ উঠে আসছে তার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাণের সন্ধান করে চলেছে অদিতি।

ক্যাম্প থেকে হাতদশেক দূরেই ড্রিল-হাউস। সেখানে সবচেয়ে আধুনিক সবচেয়ে দামি কোর ড্রিল চলছে। ড্রিলিং-এর ধকধক আওয়াজ দুস্তর বরফে ঢাকা শ্বেত-শুভ্র শান্ত মহাদেশকে যেন শব্দের ঝড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে।

এখন ড্রিল-হাউসে ডিউটিতে আছে পবন শর্মা—আমাদের দলের ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। একটানা ছ'ঘণ্টা ওর ডিউটি—সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো। তারপর আমার পালা—আবার ছ'ঘণ্টা। সন্ধের পর ড্রিলের বিশ্রাম, যদিও আমাদের বিশ্রাম নেই। মাপজোখের কাজ, গভীর স্তর থেকে

তুলে নিয়ে আসা আইস কোর-এর স্যাম্প্‌ল স্টেরিলাইজ্‌ড কনটেনারে রেখে তার গভীরতা গায়ে লিখে রাখা, সেই বরফের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস, তার কার্বন-ফোরটিন ডেটিং—এসব চলতে থাকে। বিশবছর আগেও কার্বন-ফোরটিন ডেটিং-এর শতকরা নব্বই ভাগ সঠিক উত্তর পেতে প্রায় একহাজার কিলোগ্রাম স্যাম্প্‌ল লাগত। এখন লাগে এক কিলোগ্রামেরও কম। তা থেকেই বিশ্লেষণ করে জানা যায় ওই বরফের স্তর কত হাজার বা লক্ষ বছরের পুরোনো।

আমরা তিনজন ড্রিল-হাউসের কাছে পৌঁছলাম। কনকনে ঠান্ডা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ড্রিল-হাউসের সারা গায়ে আন্টার্কটিকার তুষারঝড়ের চিহ্ন। কোথাও ধাতুর পাত তুবড়ে গেছে, কোথাও আবার কাঠের দেওয়াল কমজোরি হয়ে খসে পড়ায় তার ওপরেই অন্য কাঠের তক্তা পেরেক ঠুকে এঁটে দেওয়া হয়েছে। মাসপাঁচেক আগে বাড়িটার মাথায় একটা অ্যালুমিনিয়াম রডের সঙ্গে একটা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ বেঁধে উড়িয়ে দিয়েছিলাম—এখন সেটা বরফে ঢেকে শক্ত হয়ে গেছে...যেন একটা ভাস্কর্য।

ড্রিল-হাউসের দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ!

তখন চন্দ্রেশ্বরকে বললাম, 'পবন ভেতরেই আছে—কিন্তু দরজা বন্ধ কেন? তুমি বরং বাকিদের ডেকে জোগাড় করো।'

চন্দ্রেশ্বর হাঁটা দিল ক্যাম্পের দিকে।

রোহিত বলল, 'দাদা, আমি অদিতিকে ডেকে নিচ্ছি।' বলেই অদিতির তাঁবুর দিকে এগোল।

আমার দলের প্রতিটি সদস্যের একটা জায়গায় খুব মিল—ওরা সকলেই কাজ করতে ভালোবাসে।

ড্রিল-হাউসের ভেতর ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট আর কোর ড্রিলের বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বাড়িটার দেওয়ালগুলো কাঁপছিল থরথর করে।

কিন্তু পবন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল কেন!

ড্রিল-হাউসের দরজা বন্ধ করে তো আমরা কাজ করি না! আর এখান থেকে বেরোনোর অন্য কোনও দরজাও তো নেই!

এলোমেলো চিন্তা শুরু হয়ে যাচ্ছিল। অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটার বুকের রক্তের ছিটের সঙ্গে কি এই বন্ধ দরজার কোনও সম্পর্ক আছে?

আরও কিছু ভেবে ওঠার আগেই ওরা সবাই আমার পাশটিতে এসে হাজির।

চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত বাকি তিনজনকে খুঁজে-পেতে নিয়ে এসেছে।

দলে আমরা মোট সাতজন। ছ'জন ড্রিল-হাউসের বাইরে—একজন ভেতরে।

আমি ওদের পেঙ্গুইনটার কথা বললাম। তারপর চেঁচিয়ে পবনের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম। যদিও বুঝতে পারছিলাম, এভাবে ডেকে লাভ নেই। কারণ, ভেতরের ওই আওয়াজ ছাপিয়ে ওর পক্ষে কোনও কিছু শোনা বোধহয় সম্ভব নয়।

সুরেন্দ্র নায়েক এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত রাখল, বলল, 'এভাবে ডেকে লাভ নেই, চিফ—ভেতরে কিচ্ছু শোনা যাবে না। লেট্‌স ব্রেক ওপ্‌ন দ্য ব্লাডি ডোর।'

সুরেন্দ্র আমাদের দলের কেমিস্ট—লো টেম্পারেচার কেমিস্ট্রি ওর গবেষণার বিষয়। ভারি চেহারা, গালে চাপদাড়ি, গোঁফও মানানসই। শুরু থেকেই লক্ষ করেছি, চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে গায়ের জোরে কাজ করতে ভালোবাসে।

সুরেন্দ্রর কথায় সায় দিল রোহিত চিরিমার আর অদিতি প্রধান। তবে আমাদের দলে আর একটি যে মেয়ে রয়েছে—মেরিন বায়োলজিস্ট সুজাতা—দেখলাম ওর মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছায়া নেমে এসেছে।

আমি হাতের ইশারা করতেই সুরেন্দ্র আর চন্দ্রেশ্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপরে।

অদিতির হাতে একটা আইস অ্যাক্স চোখে পড়ল। বোধহয় সাধারণ ধাক্কায় কাজ না হলে ওটা দরজার ওপরে ব্যবহার করবে।

অবশ্য তার আর দরকার হল না। দুবারের চেষ্টাতেই ড্রিল-হাউসের দরজা ভেঙে গেল। আমরা ছ'জন বলতে গেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

এবং ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম।

কারণ, ড্রিল-হাউসে কেউ নেই!

ড্রিল-হাউসে ঢুকতেই কেমন একটা অদ্ভুত অনুভব মনে ছেয়ে গেল। বিশাল উঁচু একটা কুৎসিত জটিল যন্ত্র। তাকে ঘিরে অন্যান্য ধাতুর

কাঠামো। একটা অ্যালুমিনিয়ামের মই সটান উঠে গেছে একেবারে ড্রিল-হাউসের চালের কাছে। ড্রিলের ফ্রেমটাকে নানাদিক থেকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে—যাতে তুষারঝড়ে ড্রিল-হাউসের দেওয়াল পড়ে গেলেও ড্রিলটা অক্ষত থাকে।

ইঞ্জিন-জেনারেটরের শব্দ, ড্রিলের শব্দ আমাদের কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর শব্দ-তরঙ্গগুলো যেন সত্যি-সত্যি গায়ে এসে ধাক্কা মারছিল।

সব মিলিয়ে মনের মধ্যে এমন একটা তোলপাড় হল যে, আমার রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'-র কথা মনে হল। মনে হল, যন্ত্রকে আমরা চালাচ্ছি, না যন্ত্র আমাদের চালাচ্ছে!

আমি চোখের গগল্‌স কপালে তুলে দিলাম, তারপর চন্দ্রেশ্বরের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'জেনারেটরের ব্রেকার অফ করে দাও।'

ড্রিল-হাউসের এক কোণে ভারি বেস প্লেটের ওপরে ইনস্টল করা রয়েছে ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট। তার পাশে গোটাদশেক লাল রঙের ফুয়েল ড্রাম। ড্রাম থেকে প্রায় পনেরো ফুট দূরে ব্রেকার, সুইচ, অ্যামমিটার, ভোল্টমিটার এইসব নিয়ে ছোট একটা প্যানেল। চন্দ্রেশ্বর সেদিকে এগিয়ে গেল। অফ করে দিল জেনারেটরের ব্রেকার।

মুহূর্তে সমস্ত শব্দ থেমে গেল। জেনারেটরের শক্তি নিয়ে যে-চারটে টিউব লাইট জ্বলছিল সেগুলো নিভে গেল। তবে দেওয়ালের তক্তার ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু আলো উঁকি মারছিল ভেতরে। এ ছাড়া ভাঙা দরজা দিয়ে বেশ খানিকটা আলো ঢুকে পড়েছিল। তবুও কেমন একটা আবছা অন্ধকার যেন নেমে-এল ড্রিল-হাউসে। একইসঙ্গে শীতটাও বোধহয় বেড়ে গেল।

এখন সময়টা জানুয়ারির শুরু। অতএব সূর্য সবসময়েই আকাশে। একুশে ডিসেম্বর সূর্যটা দিগন্ত থেকে নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়েছিল। ফলে দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর এতটুকু হেরফের হয়নি। তার পরদিন থেকেই রাত বারোটায় ঠিক দক্ষিণ দিক বরাবর সূর্য একটু করে নেমে যায়। তারপর দিগন্ত বরাবর আকাশ পরিক্রমা করতে-করতে দুপুর বারোটায় ঠিক উত্তরের আকাশে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছয়। অর্থাৎ, সূর্য সবসময়েই আকাশে—তবে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কাত

হয়ে ঘোরে।

ভাঙা দরজা দিয়ে ঢুকে-পড়া আলো ভরসা করে আমরা পবন শর্মাকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমার মন বলছিল ওকে আর পাওয়া যাবে না। তবুও আমরা ওর নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডেকে উঠলাম।

কিন্তু কোনও উত্তর পেলাম না।

আধঘণ্টা ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পবন শর্মার কোনও হদিশ পেলাম না আমরা। আমাদের দলের ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার যেন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সুরেন্দ্র নায়েক আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। কথা বলার সময় ওর নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। এখন উষ্ণতা মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস—আন্টার্কটিকার উষ্ণতম সময়। অথচ আমরা শীতে কাঁপছি।

'চিফ, ড্রিল-হাউসের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করল কে? পবন শর্মা?'

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'আর কে হতে পারে! আমরা বাকি ছ'জন ড্রিল-হাউসের বাইরে ছিলাম...।'

অদিতি মাথা নাড়ল ঃ 'সুখদা, পবন ড্রিল-হাউসের দরজা বন্ধ করবে কেন? এখানে তো কিছু চুরি যাওয়ার ভয় নেই!'

'সেটাই তো অবাক লাগছে, অদিতি—' আমি গ্লাভ্স পরা হাত দুটো ঘষলাম ঃ 'ড্রিল চালু রেখে পবন উধাও হল কোথা দিয়ে? আর কেনই বা হল? তা ছাড়া ওই অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটার গায়ে রক্তের ছিটেগুলো মিথ্যে নয়...।'

রোহিত বলল, 'দাদা, পবন কি দরজা বন্ধ করে ড্রিলটাকে নিয়ে কোনও লটঘট করতে চাইছিল?'

'কী লটঘট করবে?' আমি অবাক হয়ে রোহিতের দিকে তাকালাম।

উত্তরে সুজাতা বলল, 'যাতে আর ড্রিল না করা যায়...।'

আমি চমকে সুজাতার দিকে ফিরে তাকালাম। আমাদের ড্রিলিং-এর কাজ বন্ধ হলে পবনের কী লাভ?

সে-কথাই জিগ্যেস করলাম ওকে।

উত্তরে ও যা বলল তা বেশ রোমাঞ্চকর।

পবন শর্মার বিশ্বাস ছিল, ড্রিল করে আমরা যেই লেক এক্স-এর জলে পৌঁছব অমনই ঘটে যাবে এক বিপর্যয়। প্রাগৈতিহাসিক কোনও সরীসৃপ হয়তো ক্ষিপ্র গতিতে ড্রিলিং শ্যাফ্‌ট বেয়ে উঠে আসবে। তারপর এই বরফে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তরে আমাদের বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে।

পবন খুব ফূর্তিবাজ ছেলে ছিল। তবে ওর মধ্যে খ্যাতির লোভ ছিল। নিজের লাভ-ক্ষতি নিয়ে বড্ড বেশি ভাবত।

এই তো, গত পরশু রাতে খাওয়ার সময় ও হঠাৎই আমাকে জিগ্যেস করেছিল, 'ডক্টর সেন, এবারের এক্সপিডিশান আর রিসার্চ নিয়ে আমরা যে-রিসার্চ পেপার লিখব তাতে সবার নাম থাকবে নিশ্চয়ই?'

আমি বলেছিলাম, 'অবশ্যই থাকবে।'

তখন ও খুশি-খুশি মুখে বলেছিল, 'চিফ, তা হলে দারুণ ব্যাপার হবে, বলুন। সারা পৃথিবী আমাদের নাম জেনে যাবে। পাঁচ লক্ষ বছর ধরে আইসোলেটেড একটা লেকের জল নিয়ে আমরাই প্রথম রিসার্চ করব। সেই জলের পোকামাকড়, ব্যাকটিরিয়া—।'

আমি ওকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'বড়সড় সাপ-টাপ, মানে, রেপটাইলও থাকতে পারে, পবন। অবশ্য আছে কি না সেটা বোঝা যাবে আর চার-পাঁচদিনের মধ্যেই। কারণ, ড্রিলিং-এর মিটার রিডিং দেখে যেসব ক্যালকুলেশন আমি আর রোহিত করেছি তাতে আমরা শিওর যে, আর চার-পাঁচদিন এইভাবে ড্রিল করে গেলে আমরা আইস শিট পেনিট্রেট করে লেক এক্স-এর জলে পৌঁছে যাব।'

পবন আমার শেষ কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। কেমন একটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল।

তারপর, বেশ কয়েক সেকেন্ড পর, বিড়বিড় করে বলল, 'সাপ-টাপ...রেপটাইল...যদি ওটা ড্রিলিং হোল দিয়ে ওপরে উঠে আসে!'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'এতটা কল্পনা করা ঠিক নয়, পবন। তবে রেপটাইল ইজ আ পসিবিলিটি।'

পবন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠেছিল, 'ও মাই গড!'

পরদিনই জেনেছিলাম, ওর এই ভয়ের কথাটা ও অনেককেই বলেছে। আরও বলেছে, ইমিডিয়েটলি ড্রিলিং বন্ধ করা উচিত।

কিন্তু আমি সে-কথায় গা করিনি। কারণ, এই কুমেরুতে এসে এই প্রবল ঠান্ডায়, বরফে ঢাকা নির্জন প্রান্তরে অনেকেরই মানসিক দোলাচল দেখা দেয়। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার দুটো ঘটনাও ঘটেছে গত তিরিশ বছরের নানান অভিযানে। পবনের কি সেরকম গোলমাল কিছু হল?

কিন্তু ড্রিলটা চালু অবস্থায় রেখে ও তো কোথাও যাবে না! ওর দায়িত্ববোধ আমাদের কারও চেয়ে কিছু কম ছিল না।

সুজাতাকে বললাম যে, পবন শর্মার ওই ভয়ের ব্যাপারটা আমিও জানি। তবে ও যে হঠাৎ করে কোনও ছেলেমানুষী কাজ করে বসবে না সে-বিশ্বাস আমার আছে।

রোহিতের গলায় বাইনোকুলার ঝুলছিল। সেটা চেয়ে নিয়ে আমি সিলিং ছোঁওয়া মইটার কাছে এগিয়ে গেলাম। বাকিদের বললাম, আমি ড্রিল-হাউসের চালে উঠে একবার চারপাশটা দেখে আসি—যদি কোনও ট্রেস পাওয়া যায়।

মই বেয়ে একেবারে ড্রিল-হাউসের চালের কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানে একটা চৌকোনা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি একটা হ্যাচ রয়েছে। জোরে চাপ দিতেই হ্যাচ খুলে গেল। কয়েকটা বরফের টুকরো খসে পড়ল আমার গায়ে-মাথায়। ঠান্ডা ঢুকে পড়ল চৌকো ফোকর দিয়ে। ওপরের উজ্জ্বল নীল আকাশও দেখা গেল—ঠিক যেন নীল-রঙা এক ডাকটিকিট।

এই হ্যাচটা মাঝে-মধ্যে খোলা হয় বলে বরফ তেমন পুরু হয়ে জমেনি। শরীরটা হ্যাচের ফোকর দিয়ে গলিয়ে বাইরে খানিকটা নিয়ে আসতেই চোখে পড়ল চালের অন্যান্য জায়গায় বরফ বেশ পুরু।

একটা আয়রন গ্রেটিং-এর ওপরে সাবধানে দাঁড়িয়ে শরীরটা সোজা করলাম। ফলে আমার কোমর পর্যন্ত এখন চালের বাইরে। সেই অবস্থায় বাইনোকুলার চোখে দিয়ে নজর চালালাম চারপাশে।

যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। তারই মধ্যে বরফের ঢেউ ওঠা-নামা করেছে—অনেকটা মরুভূমির মতন।

আন্টার্কটিকার আবহাওয়া এত বিশুদ্ধ আর বাতাস এত পরিষ্কার যে, আমাদের মতো শহুরে মানুষের পক্ষে কোনও কিছুর দূরত্ব আঁচ করা একরকম অসম্ভব। তবুও আমার ধারণা, আমি প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। ঠান্ডা হাওয়ায় আমার শরীরের



ভেতর পর্যন্ত কেঁপে যাচ্ছিল। আঙুলের ডগাগুলো প্রায় অসাড়। তা সত্ত্বেও ধীরে-ধীরে নজর বোলালাম চারপাশে।

কেউ কোত্থাও নেই!

শুধু চোখে পড়ছে বাঁশের কঞ্চির ডগায় দাঁড়িয়ে থাকা কতকগুলো কমলা রঙের পতাকা, আর লাল রঙের খালি প্লাস্টিকের ড্রাম—তার অনেকটাই বরফে ঢেকে গেছে। আন্টার্কটিকার বরফের 'সমুদ্রের' মধ্যে পথের হদিশ পাওয়া খুব মুশকিল বলে পথ বরাবর নিশানা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ওগুলো সেই নিশানা—আমাদের তিন নম্বর ক্যাম্পে যাওয়ার পথ।

এ ছাড়া কৃত্রিম পেঙ্গুইন কুকারিটাও চোখে পড়ল।

বৃত্তাকারে নজর ঘোরানো যখন শেষ করলাম তখন আমার আঢাকা গালদুটো জমে হিম হয়ে গেছে। আঙুলের ডগাগুলো টনটন করছে। চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে নামছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর নামতে পারেনি—গালের ওপরে জমে বরফ হয়ে গেছে।

আমি আর পারছিলাম না। হ্যাচ বন্ধ করে নেমে এলাম, তারপর মই বেয়ে সোজা নিচে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখি পাঁচজনের চোখে নীরব প্রশ্ন।

তার উত্তরে মাথা নাড়লাম আমি। তাতেই ওরা বোধহয় বুঝে গেল পবনকে আর কোনওদিনই পাওয়া যাবে না।

আমি একটুও দমে না গিয়ে বললাম, 'অন্তত আরও দু-ঘণ্টা আমরা পবনকে খুঁজব। তারপর ফাইনাল ডিসিশান নেব। আপাতত বেস ক্যাম্পকে কিছু জানাব না। তবে ড্রিলিং-এর কাজ পালা করে চালিয়ে যাব। লেক এক্স-এর জলে আমাদের পৌঁছতেই হবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ।' একটু থেমে চন্দ্রেশ্বরকে লক্ষ করে বললাম, 'পবনকে খোঁজা শেষ হলে তুমি ড্রিলিং ডিউটি শুরু করবে, গুপ্তা। ও. কে., নাউ লেট্‌স মুভ।'

ড্রিল-হাউসের বাইরে বেরিয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম আশেপাশে। যেদিকে চোখ যায় বরফ, শুধুই বরফ।

অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো এই পোল অফ ইনঅ্যাক্‌সেসিবিলিটি। এখান থেকে বরফের ঢাল নেমে গেছে উপকূলের দিকে। আন্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রের মোট এলাকা প্রায় সাড়ে তেরো মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার—

ভারতের আয়তনের চারগুণেরও বেশি। এই বিশাল এলাকার জমাট বরফ কিন্তু থেমে নেই—খুব ধীরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তবে এই প্রবাহ ঠিক তরলের প্রবাহের মতো নয়—বরং ধাতু বা শিলার মতো ক্রিস্ট্যালাইন পদার্থের প্রবাহ—যাকে আমরা সায়েন্টিস্টরা বলি 'প্লাস্টিক ফ্লো'।

আন্টার্কটিকার বরফ অসংখ্য ছোট-ছোট বরফের ক্রিস্ট্যাল দিয়ে তৈরি। এই জমাট বরফ প্রবাহিত হয়েই হিমবাহের জন্ম হয়—ঠিক যেন বরফের এক নদী। সরতে-সরতে এই হিমবাহ চলে যায় সমুদ্রে। সমুদ্রের কিনারায় তৈরি হয় 'আইস শেল্‌ফ' বা হিমসোপান। সেই ভাসমান হিমসোপান থেকে কিছু-কিছু অংশ ভেঙে 'আইসবার্গ' বা হিমশৈল হয়ে ভেসে পড়ে সমুদ্রে। এক-একটি আইসবার্গের মাপ এক-একটি দেশের সমানও হতে পারে। ১৯২৬ সালে নরওয়ে অভিযানের নাবিকরা প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার লম্বা একটি আইসবার্গ দেখেছিল। আর ১৯৬৫ সালে রুশ নাবিকরা আন্টার্কটিকার এন্ডারবি ল্যান্ডের কাছে প্রায় একশো চল্লিশ কিলোমিটার লম্বা আর পাঁচহাজার বর্গকিলোমিটার মাপের একটি আইসবার্গ দেখেছিল।

বরফের এই প্লাস্টিক ফ্লো-র জন্যেই ড্রিলিং-এর কাজটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ড্রিল করা গর্তটা পুরোপুরি খাড়া না থেকে বেঁকে যেতে চায়। সেসব দিকে নজর রেখেই আমরা ড্রিলিং-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের দলের নিয়ম হচ্ছে কেউ একা কোথাও ক্যাম্প ছেড়ে বেরোবে না। অন্তত দুজন সবসময় যেন একসঙ্গে থাকে। তাই ওরা পাঁচজন দুটো দলে ভাগ হয়ে হাঁটা শুরু করল দু-দিকে। আমি বললাম, ওরা যেন মোটামুটিভাবে দু-তিন কিলোমিটারের বেশি দূরে না যায়।

বরফের ওপরে নানানদিকে পায়ের ছাপের চিহ্ন। আমাদেরই হাঁটা-চলার প্রমাণ। এর মধ্যে পবনের পায়ের ছাপ আলাদা করে বোঝার কোনও উপায় নেই। সুতরাং, খানিকটা আন্দাজে ভর করে এলোমেলো খোঁজ করাটাই একমাত্র পথ।

ওরা রওনা হয়ে পড়লে আমি হাঁটা দিলাম টয়লেটের দিকে।

টয়লেট বলতে ক্যাম্প থেকে বিশ-পঁচিশ মিটার দূরে বরফের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি বড়সড় জায়গা। টয়লেটে যেতে হলে আইস অ্যাক্স হাতে নিয়ে যেতে হয়। ভালো করে গর্ত খুঁড়ে কাজ সেরে আবার সেটা ঢেকে

দিতে হয় বরফ দিয়ে। আন্টার্কটিকার এই অঞ্চলে যেরকম ঘন-ঘন তুষারঝড় হয় তাতে মাঝে-মাঝেই টয়লেটের বরফ ড্রেসিং করতে হয় আমাদের।

এই অঞ্চলটায় ঘন-ঘন তুষারঝড়ের মূল কারণ 'টেম্পারেচার ইনভারশন'। সাধারণত যে চাপের তফাত দিয়ে বায়ুপ্রবাহের ব্যাখ্যা করা হয়, সে-ব্যাখ্যা এখানে খাটে না। তাই এই ঝোড়ো বাতাসকে 'ইনভারশন উইন্ড' বলা হয়। আন্টার্কটিকার 'সারফেস উইন্ড'-কে তাই এককথায় অভিনব বলা যেতে পারে।

টয়লেটে আমি যে এলাম তার প্রধান কারণ এই জায়গাটা তন্নতন্ন করে কেউ খোঁজেনি। ওরা এখানে এসে খুঁজেছে পবন শর্মাকে। আর আমি খুঁজতে এসেছি...যা খুঁজতে এসেছি তা খুঁজে পেলাম।

টয়লেট এনক্লোজারের ভেতরে বরফের পাঁচিল ঘেঁষে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ। এখন জমে হিম হয়ে গেছে।

হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম, উকিলসাহেবের বুকে যে-চিহ্ন দেখেছি, এগুলোও তাই।

তা হলে কি পবন শর্মাকে কেউ খুন করেছে?

এ কথা ভাবতেই আন্টার্কটিকার শীত ভুলে গিয়ে অন্যরকম শীতে আমি কেঁপে উঠলাম।

কে জানে, বাকি পাঁচজনও হয়তো এই খারাপ প্রশ্নটার কথাই মনে-মনে ভাবছে।

আমি তাড়াতাড়ি ফিরে চললাম ক্যাম্পের দিকে। একটা আইস অ্যাক্স নিয়ে এসে টয়লেটের নানান জায়গা খুঁড়ে দেখতে হবে।

পবন শর্মার ডেডবডি অথবা খুনের অস্ত্রটা আমি খুঁজে পেতে চাই। কিংবা দুটোই।

দুই

রাতে ডিনারের সময় সকলের মধ্যেই কেমন একটা চাপা টেনশান টের পেলাম।

টিনের খাবার ফুটিয়ে অদিতি আর সুজাতাই গ্যাসের স্টোভে

রান্নাবান্না করেছে, আর ছাত্র-রাঁধুনি হিসেবে সুরেন্দ্র নায়েক ওদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছিল।

রান্না বেশ ভালো হওয়া সত্ত্বেও কারও মধ্যে খুশির মেজাজ নেই। সকলেই অদ্ভুতরকম চুপচাপ।

নিস্তব্ধতা যখন পুরু চাদরের মতো চেহারা নিয়েছে তখন রোহিত তার ওপরে কথার ছুরি চালাল।

'দাদা, পবন শর্মাকে তা হলে আর পাওয়া যাবে না?'

আমি কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বললাম, 'বোধহয় আর পাওয়া যাবে না। কারণ, ও আর নেই।'

অদিতি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু কয়েকটা হেঁচকির মতো শব্দ তুলেই ও দাঁতে দাঁত চেপে কান্নাটাকে থামাল।

পবনের সঙ্গে ওর দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। শুধু বন্ধুত্ব কেন—তার চেয়েও কিছু বেশি। ওরা সবসময় একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসত। অনেকসময় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি, ওরা দুজনে পবনের কেবিনে খুব ঘন হয়ে বসে গল্প করছে। আন্টার্কটিকার এই নির্জনতা মানুষকে বড় তাড়াতাড়ি কাছাকাছি নিয়ে আসে।

কাজের ফাঁকে বাড়তি সময় পেলেই পবন অদিতিকে তাসের ম্যাজিক শেখাত। আর লক্ষ্ণৌ-এর মেয়ে অদিতি পবনকে ক্লাসিক্যাল গান নিয়ে জ্ঞান দিত। সেই জ্ঞানের পরিণাম হিসেবে পবন এমন সব বেসুরো গান গাইত যে, আমরা হেসে কুটিপাটি। তার ওপর ওর ফেবারিট গান ছিল 'সারে জহাঁসে আচ্ছা'—তাও আবার 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর সুরে। কাজটা এত কঠিন ছিল যে, আমরা অনেকে বহু চেষ্টা করেও গানটা ওই ঢঙে গাইতে পারিনি। তাই আমরা এই গানটার নাম দিয়েছিলাম 'পবন স্পেশাল'।

আমি গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, 'আমি দুপুরে আমাদের স্টোরে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছি। গুনতিতে একটা আইস অ্যাক্স কম আছে।'

চন্দ্রেশ্বর সিগারেট খাচ্ছিল। ও নস্যিও নেয়, খইনি খায়, পান কিংবা পানপরাগেও আপত্তি নেই। জিগ্যেস করলেই বলে, 'মস্ত্ চিজ হ্যায়—লাজবাব।'

আমরা ঠাট্টা করে বলি ভগবান ওকে যাবতীয় নেশা করার জন্যেই

পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তা থেকে যেটুকু অবসর পায় সেই সময়টায় ও ভূতত্ত্বচর্চা করে। তাতে ও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'না, আমি দুটোই একসাথ করি।'

এখন ও জিগ্যেস করল, 'বস, আর য়ু শিয়োর পবন ইজ ডেড?'

'হ্যাঁ। কারণ, একটা আইস অ্যাক্স উধাও, পেঙ্গুইনের বুকে রক্তের দাগ, টয়লেটের বরফে রক্তের ছিটে—সবগুলো যোগ দিলে একটাই আন্‌সার পাওয়া যায়—পবন ইজ ডেড। আর আমার ধারণা, ওর ডেডবডিটা এখানে আশেপাশে বরফের নিচেই কোথাও চাপা দেওয়া আছে।'

'কে—কে খুন করেছে ওকে?' রোহিত জানতে চাইল।

আমি ঠোঁট টিপে মাথা নাড়লাম হতাশায়, বললাম, 'জানি কে খুন করেছে...।'

সবাই চমকে টানটান হয়ে বসল আমার কথায়।

'...যে খুন করেছে সে এখন এই ক্যাম্পে আমাদের চোখের সামনে বসে আছে।' তেতো গলায় বললাম আমি। 'কারণ বাইরের কেউ এখানে এসে পবনকে খুন করতে পারে না।'

'যদি প্লেন বা হেলিকপ্টারে করে এসে থাকে?' এ-কথা বলল অদিতি। এখন ও নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। অন্তত ওপর-ওপর দেখে তাই মনে হচ্ছে।

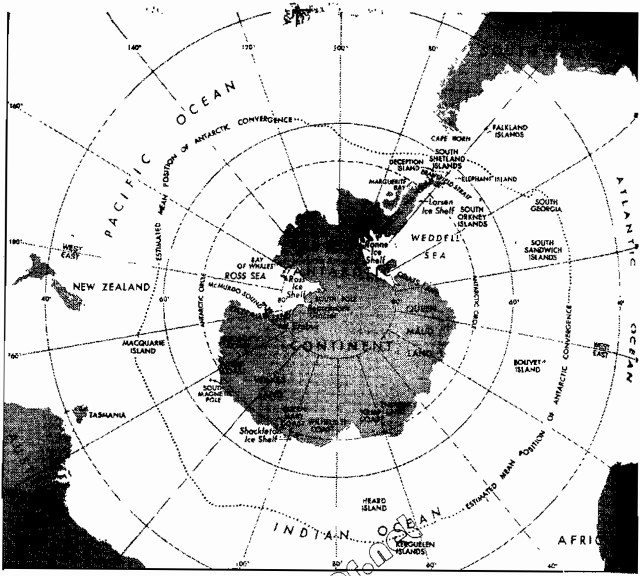
সুরেন্দ্র নায়েক তড়িঘড়ি আপত্তি জানিয়ে বলল, 'না, না—সেটা হলে আমরা ইঞ্জিনের শব্দ পেতাম। তা ছাড়া, যে-কোনও প্লেন এই এরিয়ায় এসে ল্যান্ড করতে পারবে না। স্পেশাল প্লেন দরকার।'

'যদি কেউ পায়ে হেঁটে চুপিসারে এসে কাজ সেরে যায়...।'

বুঝতে পারলাম, অদিতি কিছুতেই মানতে পারছে না আমাদেরই একজন পবনকে খতম করেছে। কিন্তু বাস্তব তো এরকমই হয়। কিছু করার নেই।

অদিতির কথার জবাব দিতে হল না। তার আগে ও নিজেই বিড়বিড় করে বলল, 'এই পোল অফ ইনঅ্যাক্‌সেসিবিলিটিতে কে-ই বা পায়ে হেঁটে আসতে পারবে!'

আমি বললাম, 'ঠিক ধরেছ। আমাদের তিন নম্বর ক্যাম্প এখান



আন্টার্কটিকার মানচিত্র 'জুনিয়ার ব্রিটানিকা'র সৌজন্যে-

থেকে অন্তত নব্বই কিলোমিটার দূরে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, সেখান থেকে কেউ পায়ে হেঁটে আমাদের এই ক্যাম্পে আসতে চায়, তা হলে ব্যাপারটা অনেকটা মই বেয়ে আকাশে পৌঁছনোর চেষ্টার মতো হাস্যকর শোনাবে—তাই না?'

কেউ কোনও জবাব দিল না।

আমি ওদের মুখের দিকে একে-একে তাকালাম।

চন্দ্রেশ্বর গুপ্তা। ভালোমানুষ টাইপের চেহারা। জিওলজিস্ট হিসেবে বেশ চৌকস। রোগা শরীর, তবে শক্তি কম নয়। কাজ না থাকলে এর-ওর সঙ্গে মজা করে। কিন্তু এখন সব মজা উবে গেছে।

রোহিত চিরিমার। খুব নিয়ম মেনে চলে। বরফ সম্পর্কে অনেক জানে। আমাকে প্রথম আলাপের পর থেকেই 'দাদা' বলে ডাকে। অভিযানে এসে আজ পর্যন্ত কোনও পরিস্থিতিকেই ভয় পায়নি। সবসময় নির্বিকার। একবার বরফের ফাটল থেকে আমাকে রেসকিউ করেছিল। ফাটলের

ওপরটা বরফ জমে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেখানে পা ফেলতেই আমি ভেতরে পড়ে যাই। আমাকে রোহিত এমনভাবে উদ্ধার করেছিল যেন একগ্লাস জল খাচ্ছে—ব্যাপারটা এতই সাধারণ ছিল ওর কাছে। এ থেকেই বোঝা যায় ওর নার্ভ কেমন শক্ত।

ক্যাম্পের কাঠের মেঝেতে বসে ছিল সুজাতা রায়। একটু ভিতু টাইপের। অভিযানে এসে থেকে বেশ কয়েকবারই আমাকে বলেছে, 'লেক এক্সকে ডিসটার্ব করে কোনও লাভ আছে, সূর্যদা?'

আমি ওকে বোঝাতে চেয়েছি : 'আমরা না করলেও আগামীদিনের কোনও গবেষক লেকটাকে ডিসটার্ব করবেই, সুজাতা। তার চেয়ে প্রথম হওয়াটাই কি ভালো নয়! ভাবো তো, কত সম্মান, কত খ্যাতি, কত প্রচার! দেশে ফিরে অন্তত কয়েকমাস তো তোমাকে নানান টিভি চ্যানেলে হাজিরা দিতে হবে। তুমি সেটা চাও না?' তখন সুজাতা বলেছে, 'হ্যাঁ, চাই—তবে প্রাণের বিনিময়ে নয়। ওই লেকের জলে...।'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়েছি আমি : 'এসব তোমার উলটোপালটা আজগুবি সব সিনেমা দেখার ফল—"গডজিলা" আর "জুরাসিক পার্ক"-এর মতো।'

অদিতি প্রধান। মাইক্রোবায়োলজিস্ট। সাহসী—তবে বেশ হিসেব করে চলে। পবনকে বেশ পছন্দ করত। এখন দুঃখ পেলেও ও যে-ধাতের মেয়ে তাতে সামলে উঠে বদলা নিতে চাইবে—পাগলের মতো খুঁজে বেড়াবে খুনিকে। তবে ও গান ভালোবাসে। হাতে সময় পেলেই টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট চালিয়ে মন দিয়ে শোনে, গুনগুন করে গানও গায়।

সুরেন্দ্র নায়েকের কোনও সমস্যা নেই। কী করতে হবে সেটা ওকে জানিয়ে দিলেই হল। বেপরোয়া। ধৈর্য বড় কম। সবসময় 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' গোছের ঢঙে চলাফেরা করে। আর ফাঁক পেলেই বউকে চিঠি লিখতে বসে। জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ির সময়ে ওর নামে খুব ঘন-ঘন টেলেক্স আসত। তাই জাহাজের রেডিয়ো অফিসার খুরানা মাঝে-মাঝেই 'টেলেক্স ফর মিস্টার নায়েক' না বলে ঠাট্টা করে 'নায়েক ফর মিস্টার টেলেক্স' বলতেন। ওর বউ প্রায় প্রতিদিনই ওকে একটা করে টেলেক্স করত।

কিন্তু **কে? এদের পাঁচজনের মধ্যে কে?**

সত্যি করে বল, পবন শর্মাকে তোদের পাঁচজনের মধ্যে কে খুন করেছিস।

আইস অ্যাক্স নিয়ে গিয়ে আমি টয়লেট স্পেসের নানান জায়গায় খুঁড়ে-খুঁড়ে দেখেছি। কিন্তু আর কোনও চিহ্ন পাইনি। এই তুষার-রাজ্যে মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা খুব সহজ। বরফে একবার চাপা দিতে পারলেই কেউ আর তার কোনও হদিশ পাবে না। আর এখানে মৃতদেহ কখনও বিকৃত হয় না, পচে-গলে গন্ধ বেরোয় না। ফলে বছরের-পর-বছর একইরকম গোপন থেকে যায়। কেউ টের পায় না।

পবন শর্মার ডেডবডির সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো খুনের অস্ত্রটাও খুনি বরফের নিচে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঠিক আছে। মেনে নেওয়া গেল যে, খুনটা টয়লেট স্পেসেই হয়েছে। কিন্তু সেখানে পবন গেল কেমন করে! যেখানে ড্রিল-হাউসের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! ড্রিল গমগম করে চলছে!

ক্লোজ্‌ড রুম প্রবলেমটাকে যদি আপাতত বাদ রাখা যায় তা হলে খুনের বাকি গল্পটা দিব্যি অনুমান করা যায়।

আমরা নানান দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছি। পবন শর্মা ড্রিল-হাউসে একমনে কাজ করছে। খুনি—যে পবনের খুব চেনা, আমাদেরই একজন—গিয়ে ওকে যা-হোক-একটা ছল-ছুতোয় ডেকে নিয়ে এল। আইস অ্যাক্সটা খুনি আগে থেকেই টয়লেটে রেখে এসেছিল। পবনকে মন-গড়া একটা গল্প শুনিয়ে সে টয়লেটে যেতে বলল। তারপর অন্য পথ ধরে ঘুরপাক খেয়ে একটু পরে সে-ও গিয়ে হাজির হল টয়লেটে। উকিলসাহেব ওদের যে-কোনও একজনের পিছু ধরে টয়লেটে চলে গিয়েছিল। তারপর...।

তারপর খুনি পবনের গলায়, ঘাড়ে, কিংবা বুকে ধারালো আইস অ্যাক্স সজোরে চালিয়ে দিয়েছে। পবন শর্মা নিশ্চয়ই তখন বসে ছিল—নইলে উকিলসাহেবের বুকে রক্ত ছিটকে লাগার কথা নয়। আর আমাদের সবারই গায়ে ভারী প্যারাশুটের জ্যাকেট—রক্ত-টক্ত লাগলেও অনায়াসেই মুছে ফেলা যায়। এই ঠান্ডায় সেই কাজটা আরও সহজ। তাই খুনির পোশাকে রক্তের দাগ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু পবন শর্মা আর খুনি কখন টয়লেটে গিয়েছিল সেটা বোঝা খুব মুশকিল। কারণ, ড্রিলের শব্দ মোটেই বন্ধ হয়নি। আমরা যে যার

কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। টেরই পাইনি কখন পবন শর্মা বা অন্য কেউ টয়লেটের দিকে গেছে।

এই খুনের একমাত্র সাক্ষী খুনি আর উকিলসাহেব।

ইস, পেঙ্গুইনরা যদি কথা বলতে পারত!

ওরা পাঁচজন নিজেদের মধ্যে নানারকম কথা বলছিল। বলছিল, দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর বেস স্টেশনে পবন শর্মার খুনের খবরটা জানানো হবে কি না।

আমি ওদের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম,'খুনি এই ঘরেই আছে। অন্যরকম কিছু বলতে পারলে আমার ভালো লাগত—কিন্তু উপায় নেই। তাই খুনি ছাড়া বাকি পাঁচজনকে বলছি সাবধানে থাকতে। আত্মরক্ষা বেঁচে থাকার একটা জরুরি শর্ত। আমরা পাঁচজন যেন আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আরও বললাম, 'খুনিকেও আমার একটা কথা বলার আছে। একটা খুন যখন হয়ে গেছে তখন আর কিছু করার নেই। কিন্তু আর কোনও সমস্যা দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে সেটা সমাধান করা যেতে পারে—খুনটা কোনও সমাধানের পথ নয়। এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট—জানি না, খুনি আমার রিকোয়েস্ট শুনবে কি না।'

সবাই চুপ। কেউ একটি কথাও বলল না।

'আসলে আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে গোপনীয়তা বলে প্রায় কিছুই নেই। মানে, আমাদের সব আলোচনাই খুনি জানতে পারবে—হয়তো আলোচনাতে সে অংশও নেবে। তাকে না চেনা পর্যন্ত তাকে বাদ দিয়ে কোনও আলোচনার তেমন সুযোগ নেই। আর...' হাসলাম আমি ঃ 'যখন তাকে আমরা চিনতে পারব তখন এইরকম আলোচনার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। সত্যি, ভারি অদ্ভুত সিচুয়েশান।'

হঠাৎই অদিতি জিগ্যেস করল, 'কিন্তু, সূর্যদা, পবন খুন হল কেন?'

'জানি না।' আমি বললাম।

শুরু থেকে এই প্রশ্নটা আমার বুকের ভেতরে তোলপাড় করে চলেছে ঃ কেন খুন হল পবন শর্মা? খুনের মোটিভটা কী? হাজার ভেবেও আমি এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পাইনি।

ক্যাম্পের আবহাওয়া ক্রমশ ভারি হয়ে এসেছিল। তাই আমি কাজের

প্রসঙ্গ তুললাম। কাল কার কী ডিউটি তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।

চন্দ্রেশ্বর গুপ্তার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। তার খানিকপরেই ও একটা চকচকে ছোট প্যাকেট ছিঁড়ে উপুড় করে দিয়েছে মুখের ভেতরে। বোধহয় পানমশলা-টশলা কিছু হবে। সেটা চিবোতে-চিবোতে ও জড়ানো গলায় বলল, 'লেক এক্স-এর জল বিজ্ঞানের অনেক থিয়োরিকে হয়তো বদলে দেবে। বিশেষ করে প্যালিওজিওগ্রাফি আর প্যালিওইকোলজির অনেক চ্যাপটার হয়তো নতুন করে লিখতে হবে।'

অদিতি সায় দিল ঃ 'একটা লেক হাজার-হাজার বছর ধরে নেচার থেকে টোটালি আইসোলেটেড। তাতে খুব খুদে প্রাণী—মাইক্রোস্কোপিক ক্রিচার, জলের গাছপালা, এমনকী মাছও কয়েক লক্ষ বছর ধরে অ্যাবসলিউট আইসোলেশনে—মানে, আমাদের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়—বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ফলে সেখান থেকে নতুন কিছু পাওয়া যেতেই পারে। আমরা হয়তো অনেক নতুন-নতুন প্রজাতির খোঁজ পাব।'

সুজাতা হাতে হাত ঘষল বেশ কয়েকবার। তারপর মিনমিন করে বলল, 'ওখানে মাছ-টাছের চেয়ে বড় কিছুও থাকতে পারে, অদিতিদি।'

'তা থাকতেই পারে। তা হলে দেশে ফিরে পাবলিসিটির লেভেলটা একবার চিন্তা করো! আমরা সবাই রাতারাতি ফেমাস হয়ে যাব।'

সুরেন্দ্র হাই তুলল শব্দ করে। তারপর বলল, 'আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে! লেকের জল বা লাইফ ফর্ম টক্সিক হতে পারে—তাতে অসুখবিসুখ হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে। লেকের এনভায়রনমেন্ট আর আমাদের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকতে পারে।'

অদিতি বলল, 'তবে আমার মনে হয় লেক থেকে স্রেফ জল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এইচ টু ও।'

রোহিত বলল, 'তাই যদি হয় তা হলে আমি অন্তত শক্‌ড হব। আমি অনেক কিছু এক্সপেক্ট করছি। স্রেফ জল নিয়ে আমি দেশে ফিরতে চাই না।'

'আমিও'। চন্দ্রেশ্বর রোহিতের কথায় সায় দিল ঃ 'তবে ড্রিলটার কন্ডিশন ভালো নয়, বস। আর ক'দিন ওটার দম থাকবে কে জানে!'

আমি বললাম, 'সেটা নিয়ে আমিও চিন্তায় আছি। আমার মনে হচ্ছে

কাল কি পরশুর ভেতরে আমরা লেকের জলে পৌঁছে যাব। তার মধ্যে ড্রিলটা যেন না বিগড়োয়।'

সুরেন্দ্র আবার হাই তুলল, বলল, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—আমি শুতে গেলাম।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'পবনের ডিস্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারটা বেস স্টেশনে জানাবেন না?'

'হ্যাঁ—জানাব। কাল সকালে। পবন শর্মাকে ফিরে আসার জন্যে আমি আরও আট ঘণ্টা সময় দেব—ও যে আর নেই সেটা সম্পর্কে ডেড শিয়োর হওয়ার জন্যে এই সময়টা আমি দিতে চাইছি। তারপর দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে রেডিয়ো মেসেজ পাঠাব।'

আমরা উঠে পড়লাম। এখন বিশ্রাম নেওয়ার পালা। 'ঘুমিয়ে রাত কাটাব' এ-কথা বলাটা যদিও এখানে মানানসই নয়, তবুও অভ্যেস সহজে যায় না। কথাবার্তায় আমরা সবসময় পুরোনো অভ্যেসটাই ব্যবহার করছি।

আমাদের ক্যাম্পে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা ছোট-ছোট ঘর কাঠের পার্টিশান দিয়ে তৈরি। এ ছাড়া রয়েছে কাজ চালানোর মতো তিনটে ছোট মাপের ল্যাব। একটা স্টোর রুম, আর রান্নাঘর।

আমার খুপরিতে ঢুকে আশ্রয় নিলাম স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। স্লিপিং ব্যাগটা ঠান্ডায় বেজায় শক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ওটাকে লাঠি-পেটা করে তবে নরম করতে পারলাম।

সূর্য এখন দক্ষিণ দিগন্তে নেমে এসেছে বলে তেজ খানিকটা কমে গেছে। তবে আকাশে দিব্যি আলো রয়েছে। এখন এখানে রাত এইরকমই। প্রথম-প্রথম আমার কিছুতেই ঘুম আসত না। 'বিগ আই'—মানে, অনিদ্রা রোগ—হয়েছিল। পরে ব্যাপারটা মানিয়ে নিয়েছি।

স্লিপিং ব্যাগের অন্ধকারে ঢুকে পবন শর্মার কথা ভাবছিলাম। আমাদের ড্রিল মেশিনটার কলকবজা ও খুব ভালোভাবে জানত। সাধারণ টুকিটাকি ফল্ট ও দিব্যি চটপট সারিয়ে দিত। এখন যদি মেশিনটা হঠাৎ বিগড়ে যায় তা হলে যা-কিছু মেরামতের কাজ দলের একমাত্র ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাকেই করতে হবে। মনে-মনে চাইলাম, লেক এক্স-এ ঢোকার আগে ড্রিল মেশিনটা যেন বিকল না হয়।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর সুরেন্দ্র যখন ড্রিল-হাউসের ডিউটিতে যাচ্ছিল তখন দেখলাম, ক্যাম্পের বাইরে রোহিত চিরিমার ওর সঙ্গে কথা বলছে। হয়তো গতকালের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছে।

অদিতি তৈরি হয়ে ওর ল্যাবের দিকে যাচ্ছিল, সুরেন্দ্র আর রোহিতের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। হাত-পা নেড়ে কথা বলতে লাগল।

ব্রেকফাস্টের সময় অদিতি আমাকে জিগ্যেস করেছে রেডিয়ো ট্রান্সমিশন চালু করে বেস ক্যাম্পে ও পবন শর্মার খবরটা পাঠাবে কি না। আমি বলেছি, না, একটু পরে আমিই খবর দেব।

বেস ক্যাম্পে খবরটা দেওয়ার সময় শুধু এটুকু বললাম যে, গতকাল থেকে পবন শর্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় ও আর বেঁচে নেই।

ইচ্ছে করেই রক্তের ছিটে, হারানো আইস অ্যাক্স—এসবের কথা বললাম না। তাতে বেস ক্যাম্পের লোকজন উতলা হয়ে পড়বে, হয়তো এখানে প্লেন পাঠাতে চাইবে।

শিবির থেকে শিবিরে যাতায়াতের জন্যে প্লেনের ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের জাহাজে। দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর কাছাকাছি উপকূলে ফাস্ট আইসের কোল ঘেঁষে আমাদের জাহাজ 'অ্যাডভেন্চারার' নোঙর করে আছে। অভিযান শেষ হলে এই জাহাজে চড়েই আমরা দেশে ফিরে যাব।

বেস ক্যাম্পের নির্দেশ পেলে তবেই জাহাজ থেকে নির্দিষ্ট শিবির লক্ষ করে প্লেন ওড়ানো হয়।

আমি বললাম যে, চিন্তার কোনও কারণ নেই—সিচুয়েশান আন্ডার কন্ট্রোল। কোনও হেল্প পাঠাতে হবে না।

কারণ, পবনের এই উধাও হওয়ার ব্যাপারটা আমি নিজেই একটু খতিয়ে দেখতে চাই।

উত্তরে বেস ক্যাম্প থেকে আমাকে যা জানাল তাতে আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। ওরা বলল, ওখানে ব্লিজার্ড চলছে—কোনওমতেই প্লেন ওড়ানো সম্ভব নয়।

ওইসব অঞ্চলে তুষারঝড়ের মূল কারণ 'ক্যাটাবেটিক উইন্ড্স'। নানান ধরনের ইনভারশন উইন্ডের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল ক্যাটাবেটিক উইন্ড। এই উইন্ড দু-রকমের হয় ঃ অর্ডিনারি আর এক্সট্রর্ডিনারি। এর রহস্য এখনও বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি ভেদ করতে পারেনি। উপকূলের দিকে জমির

ঢাল যত বাড়ে ক্যাটাবেটিক উইন্ড ততই জোরালো হয়ে ওঠে। এই ঝড়ের দুরন্ত গতির মূলে রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ। আন্টার্কটিকার ঠান্ডায় বাতাসের ঘনত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেই ভারি বাতাস বরফের ঢাল বেয়ে যতই নামে ততই তার গতি বাড়তে থাকে—অনেকটা যেন দুরন্ত গতির পাহাড়ী নদীর মতন। ১৯০৮ আর ১৯১১ সালের দুটি অভিযানে আন্টার্কটিকা গিয়েছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার ডগলাস মসন। ১৯১১-র অভিযানে তিনিই ছিলেন দলনেতা। ফিরে এসে 'দ্য হোম অফ দ্য ব্লিজার্ড' নামে একটা বই লেখেন তিনি। সেই বইতে মসন ক্যাটাবেটিক উইন্ডের ভারি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ ঝড়ের গতিকে সামাল দিতে তাঁর দলের অভিযাত্রীরা সামনে এতটাই ঝুঁকে পড়ে হাঁটছিল যে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি তারা বরফের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ল।

আমি ব্লিজার্ডের খবরটা অদিতিকে দিলাম। তাতে ও বলল, 'ব্লিজার্ড অর নো ব্লিজার্ড—লেক এক্স-এর জলের স্যাম্প্‌ল আমরা নিচ্ছিই—থামছি না।'

'গুড স্পিরিট।' আমি ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম। নাঃ, আমার দলের এই মেয়েটা বেশ সাহসী আর ডাকাবুকো।

ড্রিল করে যে-আইস কোরগুলো উঠছে আমরা সেগুলো নানানভাবে পরীক্ষা করে দেখছি। গতকালের কয়েকটা কোর স্যাম্প্‌ল এখনও টেস্ট করা বাকি।

আমি রোহিত, সুরেন্দ্র আর অদিতির দিকে খানিকটা এগোতেই সুরেন্দ্র চেঁচিয়ে বলল, 'চিফ, একটু ড্রিল-হাউসে চলুন—স্টার্ট-আপে একটু হেল্‌প করবেন।'

আসলে ড্রিলটা চালু করার সময় দুজন লোক লাগে। নানারকম প্রোটেকশন লজিক চেক করতে হয়। লুব্রিক্যান্ট দিতে হয় অনেক জায়গায়। তারপর চালু করা—সেটা একার পক্ষে সহজ নয়। ড্রিল চালু অবস্থায় আমি আর পবন মাঝে-মাঝে ওটা দেখতে যেতাম যে ওটা ঠিকমতো চলছে কি না। এখন এই কাজটা আমার একার ঘাড়ে পড়েছে।

অদিতি আর রোহিত বোধহয় অদিতির ল্যাবের দিকে যাচ্ছিল। সুরেন্দ্রর কথায় অদিতি রোহিতকে বলল, 'তুমি এগোও—আমি মিস্টার নায়েকের সঙ্গে গিয়ে একটু হাত লাগিয়ে দিই।' তারপর আমাকে লক্ষ

করে ঃ 'সূর্যদা, আপনি বরং আপনার কাজ করুন—এদিকটা আমি হেল্প করছি।'

অদিতি আর সুরেন্দ্র চলে গেল ড্রিল-হাউসের দিকে।

আমি আর রোহিত কিছুক্ষণের জন্যে কাজের কথায় ডুবে গেলাম।

একটু পরেই দেখি অদিতি ড্রিল-হাউস থেকে বেরিয়ে আসছে। আমাদের কাছে এসে ও হাতে হাত ঘষে হাত ঝাড়তে লাগল। তারপর হেসে বলল, 'মিস্টার নায়েকও এখন ভয় পেয়ে গেছে। বলছে, অদিতি ওই জলে কী আছে নোবডি নোজ। আমরা তো আমাদের লজিক দিয়ে চিন্তা করে বলছি ওই লেকে কোনও মন্‌স্টার রেপটাইল নেই—কোনও ভয়ংকর প্রাণীও নেই। কিন্তু আমরা কি জোর দিয়ে এ-কথা বলতে পারি...। তো আমি ওকে সাহস দিয়ে এসেছি।'

অদিতির কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরঘর শব্দে ড্রিল চালু হয়ে গেল। সুরেন্দ্র নায়েক ড্রিল স্টার্ট করে দিয়েছে।

রোহিত বলল, 'আজ বিকেলে না হলেও কাল সকালে ড্রিল-বিটটা লেক এক্স-এর জল টাচ করবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম উই শ্যাল টাচ হিস্ট্রি।'

অদিতি হাত নেড়ে বলল, 'কী থ্রিলিং ব্যাপার!'

আমি বললাম, 'আমাদের খ্যাতির খানিকটা পবন শেয়ার করতে পারলে ভালো লাগত।'

এ-কথায় সবাই কেমন চুপ করে গেল।

একটু পরেই রোহিত ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চ্যাপটা ধাতুর বোতল বের করল। আমরা সবাই জানি ওতে ব্র্যান্ডি আছে। অভিযানের শুরুতেই রোহিত আমাকে বলেছে যে, শীতের দেশে ওটা না খেলে ওর চলে না। আমি যেন ওকে সে-অনুমতি দিই। শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, আমিও ওর কাছ থেকে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু চেখে দেখি। এই প্রবল ঠান্ডায় জিনিসটা দারুণ কাজ দেয়।

চকচকে বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রোহিত বলল, 'দাদা, আজ ভীষণ ঠান্ডা—ঠান্ডা তাড়াতে এক চুমুক খেতে পারেন।'

আমি বোতলটা নিলাম। দু-ঢোক খেয়ে রোহিতকে ওটা ফেরত দিলাম।

সত্যি, ঠান্ডাটা এবার কম লাগছে যেন।

রোহিত আর অদিতি এবার অদিতির ল্যাবের দিকে হাঁটা দিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখি তিনটে অ্যাডেলি পেঙ্গুইন গম্ভীরভাবে বরফের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি এবার ক্যাম্পের ল্যাবের দিকে এগোলাম। ড্রিল-হাউসের আওয়াজ শুনতে-শুনতে হঠাৎই মনে হল, শেষ পর্যন্ত ড্রিলটা টিকবে তো! শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওটা যেন মরিয়া হয়ে ব্রেকিং লোডে কাজ করছে।

ল্যাবে স্যাম্প্‌লগুলো টেস্ট করতে-করতে নানান দুশ্চিন্তার ঢেউয়ে তলিয়ে গিয়েছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল, শুধু ড্রিলটা নয়, আমরাও ব্রেকিং লোডে কাজ করছি। তবে আর বেশিদিন বাকি নেই—বড়জোর দু-চারদিন।

এইসব কথা এলোমেলো ভাবছিলাম আর যান্ত্রিকভাবে স্যাম্প্‌লগুলো টেস্ট করছিলাম। এই স্যাম্প্‌ল টেস্টিং আমি চন্দ্রেশ্বর গুপ্তার কাছে শিখেছি। আন্টার্কটিকা অভিযানে এসে শুধুমাত্র নিজের এরিয়া নিয়ে কাজ করলে হয় না, মাঝে-মাঝে দরকার পড়লে অন্য ডিসিপ্লিনেও কাজ করতে হয়। চুপচাপ বেকার বসে থাকার চাইতে শিখে-পড়ে নিয়ে সে-কাজ করা অনেক ভালো।

হঠাৎ সুজাতার কাঁপা গলার চিৎকারে আমি চমকে উঠলাম।

'সূর্যদা! শিগগির! সুরেন্দ্র নায়েককে পাওয়া যাচ্ছে না!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে স্যাম্প্‌ল স্টোর করার কয়েকটা স্টেরিলাইজড্‌ কনটেনার ল্যাবের টেবিল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে।

ঠং-ঠং করে বিচ্ছিরি শব্দ হল।

কিন্তু আমি সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গেলাম। এ কোন সুজাতা!

বরফের প্রতিফলন থেকে বাঁচতে সুজাতার চোখে রোদচশমা। দু-গালের যেটুকু দেখা যাচ্ছে সাদা, ফ্যাকাসে, রক্তহীন। জ্যাকেটের এখানে-ওখানে আর মাথার টুপিতে বরফের কুচি লেগে রয়েছে।

আর মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে, ওর ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না।

আমি ওকে দু-হাতে চেপে ধরে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তখনই ওর কাঁপুনি হাতে টের পেলাম।



সুজাতা এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিল বলে জানতাম—কারণ, দুপুরের রান্নার তদারকি ওর দায়িত্ব। আর চন্দ্রেশ্বর গুপ্তার ওকে সাহায্য করার কথা।

তা হলে সুজাতা জানল কী করে যে, সুরেন্দ্র নায়েককে পাওয়া যাচ্ছে না!

সে-কথাই জিগ্যেস করলাম ওকে।

উত্তরে ও বলল, রান্নার কাজ করতে-করতে একঘেয়ে লাগায় ও ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে বেরোয়। আমি তখন ল্যাবে কাজ করছিলাম, তাই ওর বেরিয়ে যাওয়াটা খেয়াল করিনি। ড্রিল-হাউস নিয়ে একটা ভয় ওর মনে কাজ করছিল। অথচ মেরিন বায়োলজিস্ট হিসেবে একটা কৌতূহলও মাথাচাড়া দিচ্ছিল বারবার। তাই ও সুরেন্দ্রর কাজ কতটা এগিয়েছে দেখতে ড্রিল-হাউসে যায়।

গিয়ে দ্যাখে ড্রিল চলছে তবে সুরেন্দ্র ড্রিল-হাউসে নেই।

ডাকাডাকি করে বা এদিক-ওদিক খোঁজ করে কোনও ফল না পাওয়ায় সুজাতা দৌড়ে এসেছে আমার কাছে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমি চন্দ্রেশ্বরকে রান্নাঘর থেকে ডেকে নিলাম। তারপর তিনজনে বেরিয়ে এলাম ক্যাম্পের বাইরে।

চন্দ্রেশ্বরকে বললাম, 'যাও, ওই ক্যাম্প থেকে অদিতি আর রোহিতকে ডেকে আনো এক্ষুনি।'

চন্দ্রেশ্বর অদিতির ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। আমি আর সুজাতা ড্রিল-হাউসের দিকে গেলাম।

না, এবার দরজা ভাঙতে হল না, কারণ গতকালের ঘটনার পর ড্রিল-হাউসের দরজা ইচ্ছে করেই আর মেরামত করা হয়নি। বরং বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থাটা আরও জোরদার করেছি—একটা তালাও লাগানোর ব্যবস্থা করেছি, যাতে কেউ লুকিয়ে ড্রিল-হাউসে ঢুকে ড্রিলটাকে স্যাবোটাজ করতে না পারে।

কারণ, সাফল্যের শেষ ধাপে পৌঁছে আমি বোকার মতো অসাবধানী হতে রাজি নই।

ঝড়ের সময়, ড্রিল-হাউসে যখন কেউ কাজ করছে তখন, ড্রিল-হাউসের দরজা খুলে গিয়ে বরফ ঢুকে পড়তে পারে ভেতরে। সেইজন্যে

আমি বলেছি, কয়েকটা ফুয়েল ড্রাম দরজার পাশে রাখতে—যাতে ঝড়ের সময় দরজাটা ভেতর থেকে মোটামুটি আটকে রাখা যায়।

এখন দরজা ভেজানোই ছিল। সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বিশাল যন্ত্র, বিকট শব্দ, আর সুরেন্দ্র নায়েকের গরহাজিরি আমাদের ধাক্কা মারল।

আমি আর সুজাতা যখন ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি তখন অদিতি, রোহিত আর চন্দ্রেশ্বর এসে ড্রিল-হাউসে ঢুকল।

এরপর যেন অ্যাকশন রিপ্লে শুরু হল।

পবন শর্মা উধাও হওয়ার পর আমরা যা-যা করেছিলাম, এবারও সেসব করতে লাগলাম। ড্রিল-হাউসকে তন্নতন্ন করে সার্চ করলাম। এবং ফলাফল হল বিরাট শূন্য।

অদিতি মই বেয়ে উঠে গেল ওপরে। হ্যাচ খুলে শরীরের অর্ধেকটা বাড়িয়ে দিল বাইরে। তারপর, মিনিটকয়েক পর, ও নেমে এল নিচে। আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল।

নেই। সুরেন্দ্র নায়েক কোথাও নেই।

আমি ড্রিলটা বন্ধ করলাম। তবে আলোর সার্কিটটা অন রাখলাম। ঠোঁট কামড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম।

সুজাতা আমার কাছে এসে জিগ্যেস করল, 'এবারে আপনি কী বলবেন, সূর্যদা?'

আমি ওর দিকে তাকালাম। এতদিন আন্টার্কটিকায় থাকার ধকল এবং পরপর দুজন সাথী আশ্চর্যভাবে উধাও হওয়ার ঘটনা ওকে ভীষণ চাপে ফেলে দিয়েছে।

আমিও কি চাপের মধ্যে পড়িনি? কেন সুজাতার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না?

হাতের ইশারায় সবাইকে আমি ক্যাম্পে ফিরতে বললাম।

দুপুরে লাঞ্চের পর গোলটেবিল বৈঠক বসল।

ড্রিল করার কাজ আমরা চালিয়ে যাব, না কি বন্ধ করব? এই প্রশ্নটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হল।

সকালবেলা যখন ড্রিলিং শুরু হয় তখন তো সুরেন্দ্র বহাল তবিয়তে

ড্রিল-হাউসে ছিল। কারণ, অদিতি গিয়ে ওকে সাহায্য করে বেরিয়ে আসার পর ড্রিল স্টার্ট করেছে সুরেন্দ্র। তখন আমরা ড্রিল-হাউসের কাছাকাছিই ছিলাম। সুরেন্দ্রকে চোখে না দেখলেও ওর যন্ত্রের শব্দ শুনেছি।

সুজাতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'সূর্যদা, বরফের নিচের দিকের লেয়ারে—মানে, লেক এক্স-এর কাছাকাছি লেয়ারে নতুন ধরনের কোনও বরফের পোকা নেই তো!'

'পোকা!' হেসে ফেলল চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত।

আমি বললাম, 'প্রায় ছ'মাস আমরা এখানে আছি—সেরকম কোনও পোকা আমরা দেখিনি। তা ছাড়া জমাট বরফের মধ্যে পোকা থাকবে কেমন করে!'

'যেমন করে আইসফিশ বেঁচে থাকে!'

সুজাতার কথায় রোহিত আর চন্দ্রেশ্বরের হাসি মিলিয়ে গেল পলকে। আমিও থমকে গেলাম।

ঠিকই বলেছে সুজাতা—মেরিন বায়োলজিস্টের মতোই কথা বলেছে।

আন্টার্কটিকার আইসফিশ বা বরফমাছের খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন, তাঁরা ভাবতেই পারেননি এমনটা সম্ভব। এই মাছের শরীরে একবিন্দুও হিমোগ্লোবিন নেই। এর রক্ত সাদা বললেও ভুল হয় না। আর শুধু রক্ত কেন, বরফমাছের কানকো, লিভার সবই সাদা। তবে সাধারণ লাল-রক্তের মাছের মতো বরফমাছেরও শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জন্যে অক্সিজেন দরকার হয়। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মাছের দরকারি অক্সিজেনের সিংহভাগটাই জোগান দেয় হিমোগ্লোবিন। উষ্ণতা যত কমে আসে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন জোগান দেওয়ার ক্ষমতাও ততই কমে যায়। ফলে সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা বরফমাছের অন্তত দশগুণ। কিন্তু সাধারণ মাছ আর বরফমাছ জল থেকে অক্সিজেন নেয় একই হারে। তা থেকেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, বরফমাছের হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করে সাধারণ মাছের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সহজেই। পরীক্ষা করে জানা গেছে, একই মাপের লাল-রক্তের মাছের তুলনায় বরফমাছের হৃৎপিণ্ড প্রায় তিনগুণ বড়।

যদি শারীরবিজ্ঞানের অজানা কোনও কৌশলে সত্যি এই ধরনের

কোনও পোকা থেকে থাকে বরফের অতল স্তরে! বেগুনের ভেতরে যেমন পোকার খোঁজ পাওয়া যায়—অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না—যদি সেরকম কিছু হয়!

'সুজাতা, তুমি কি বলতে চাও যে, বরফের কোনও পোকা—যার খোঁজ বিজ্ঞানীরা এখনও পাননি—ড্রিলিং শ্যাফ্‌ট বেয়ে উঠে এসেছে...তারপর পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েককে খতম করে দিয়েছে?'

গলায় যতটা জোর দিতে চেয়েছিলাম ততটা হল না। চন্দ্রেশ্বর মুখের ভেতরে কী একটা চিবোচ্ছে, কিন্তু ওর ঠাট্টার কিংবা অবিশ্বাসের ভাবটা প্রায় মিলিয়ে গেছে। রোহিত মাথা নিচু করে জ্যাকেটের ওপরে আঙুল বোলাচ্ছে। আর অদিতি নির্বিকার।

সুজাতা বলল, 'সূর্যদা, ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। আমি বলছি না যে, আইসফিশের মতো আইসওয়র্ম আছেই। আমি শুধু বলছি, ইট্‌স আ পসিবিলিটি।'

আমি খানিকটা গোঁয়ারের মতোই বলে উঠলাম, 'পোকা থাক বা না থাক আমরা থামছি না। দরকার হয় আমি একাই ড্রিল করব। লেক এক্স-এর জলের স্যাম্প্‌ল আমার চাই-ই চাই। এর জন্যেই আমরা মাসের পর মাস জানোয়ারের মতো পরিশ্রম করেছি। আমি...আমি...।'

অদিতি হঠাৎ ঠান্ডা গলায় বলল, 'আসলে আপনি ফেমাস হতে চান। রিসার্চ পেপার, টিভি ইন্টারভিউ, ওয়ার্ল্ডওয়াইড পাবলিসিটি। বিখ্যাত হওয়ার নেশায় আপনি অন্যদের কথা ভাবছেন না।'

'কেন, তুমি ফেমাস হতে চাও না? চন্দ্রেশ্বর, রোহিত, সুজাতা—ওরা চায় না!' আমি একে-একে দেখলাম প্রত্যেকের দিকে : 'ওয়েল, একটা কথা আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই। আমি থামছি না। পোকা কিংবা সাপ তো দূরের কথা, যদি ড্রিলিং শ্যাফ্‌ট বেয়ে একটা গোটা ডাইনোসরও উঠে আসে তবুও আমি থামছি না।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল।

তারপর অদিতি নরম গলায় বলল,'হ্যাঁ, আমি ফেমাস হতে চাই—বিজ্ঞানী হিসেবে। আর একইসঙ্গে বন্ধুদের বাঁচাতে চাই, নিজেও বাঁচতে চাই।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'সরি, কিছু মনে কোরো না।

আমি একটু আপসেট হয়ে পড়েছিলাম।'

সুজাতা মুখে হাত চাপা দিয়ে আচমকা উঠে চলে গেল। মনে হল যেন কান্না চাপতে চাইছে। আন্টার্কটিকার ইমোশনাল স্ট্রেস বড় মারাত্মক।

অদিতি বলল, 'সুরেন্দ্র নায়েকের স্ট্রেঞ্জ ডিস্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারটা বেস ক্যাম্পে জানাবেন তো...?'

'হ্যাঁ, জানাব—রাতে।'

প্রতিদিন রাতে আমি বেস ক্যাম্পের সঙ্গে রেডিয়ো যোগাযোগ করি। সেই খবর তারপর ছড়িয়ে পড়ে বহু জায়গায়। আন্টার্কটিকায় সারা বছর ধরেই নানান দেশের গবেষণা চলে। তার জন্যে নানান জায়গায় রয়েছে শিবির। ভারতীয় গবেষক দল এই বরফের দেশে প্রথম পা রেখেছিল ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি। সেদিনই জাতীয় পতাকা উড়েছিল দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে। তারপর থেকে নিয়মিত ভারতীয় অভিযাত্রী দল আন্টার্কটিকায় এসেছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণার ততটা গোপনীয়তা নেই, যেমনটি আছে 'অপারেশন লেক এক্স'-এর বেলায়। আমাদের এবারের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য যদি অন্যান্য দেশ জেনে যায়...তারপর ওদের দলের কেউ যদি এখানে আমাদের ক্যাম্পে এসে...নাঃ, আমিও কী সব এলোমেলো ভাবছি।

রোহিত যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে বলে উঠল, 'দাদা, অন্য কোনও রাইভাল কান্ট্রি আমাদের রেডিয়ো মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে যদি লেক এক্স-এর ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়, তারপর স্পেশাল টাইপের প্লেন নিয়ে এই অঞ্চলে এসে ল্যান্ড করে...।'

চন্দ্রেশ্বর বাধা দিল রোহিতকে ঃ 'তা হলে বেস ক্যাম্পের রেডার ওটাকে স্পট করবে অনেক আগে। আনঅথরাইজ্‌ড কোনও এয়ারক্র্যাফট এখানে ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া, যদিও-বা ঢুকতে পারে, তা হলে তার ইঞ্জিনের শব্দ আমরা নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল রোহিত ঃ 'হুঁ—ঠিকই বলেছ। এ ছাড়া পায়ে হেঁটে কোনও অ্যাকশন স্কোয়াডের পক্ষে এই পোল অফ ইনঅ্যাক্সেসিবিলিটিতে এসে পৌঁছনো অবাস্তব। কারণ, পিঠে রুকস্যাক ঝুলিয়ে আন্টার্কটিকায় এতটা পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এখানে লুকোনোর কোনও জায়গা নেই।'

আমি বললাম, 'অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট। এই থিয়োরিটা শুধু ইমপ্রব্যাব্‌ল নয়, আটারলি ইমপসিব্‌ল। বাইরে থেকে কেউ আমাদের এই ক্যাম্পে ঝড় তুলতে আসেনি—আমাদের মধ্যেই কেউ ঝড় তুলেছে।'

সবাই চুপ করে রইল। আমার কথা সকলের অপছন্দ হলেও ব্যাপারটা সত্যি। বোধহয় মনে-মনে প্রত্যেকে সেই বিশ্রী প্রশ্নটাই ভাবতে লাগল ঃ আমাদের মধ্যে কে?

প্রায় দু-মিনিট পর আমি বললাম, 'ঠিক আছে—এবারে কাজের কথা হোক। চন্দ্রেশ্বর, তুমি আর সুজাতা স্যাম্প্‌ল টেস্টিং-এ লেগে পড়ো। রোহিত আর অদিতি, তোমরা অ্যাটমোস্‌ফেরিক ডেটা কালেক্ট করো। আমি ড্রিল-ডিউটিতে যাচ্ছি।'

সুজাতা বলে উঠল, 'স্টার্ট-আপ-এর সময় আপনার একা অসুবিধে হবে, সূর্যদা। আমি আপনাকে হেল্‌প করে তারপর চন্দ্রেশ্বরের সঙ্গে টেস্টিং-এ হাত লাগাচ্ছি।'

আমি সুজাতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

মেয়েটার মনের খোঁজ পাচ্ছিলাম ধীরে-ধীরে। স্পষ্ট বুঝতে পারি, ও আমার কাছে আসতে চাইছে। অদিতি আর পবনের ঘনিষ্ঠতার কথা সুজাতাই আমাকে প্রথম জানিয়েছিল।

আমি জানি, এটাই স্বাভাবিক। বরফে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তরের এই বেনজির নির্জনতা মনকে কেমন যেন করে দেয়। তখন একটা মন আর-একটা মনের উষ্ণতা খুঁজতে চায়। কাজের সময় মন খুব ব্যস্ত থাকে বলে এলামেলো চিন্তা তেমন অসুবিধেয় ফ্যালে না। তবে হাতে বাড়তি সময় পেলেই মনটা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়। দুনিয়ার যত বাস্তব-অবাস্তব চিন্তা মনে ভিড় করে আসে।

তবে আমার কথা আলাদা। আমি যখনই এরকম ভাবার সময় পাই তখন বাড়ির কথা ভাবি। কৃষ্ণার কথা। আর আমাদের ছোট্ট মেয়ে টুসকির কথা।

টুসকিকে এত পুতুল-পুতুল দেখতে যে, শো-কেসে সাজিয়ে রাখলে লোকে ভুল করে ওকে সত্যিকারের পুতুল ভেবে বসবে।

রোহিত উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দাদা, উঠুন—এবার কাজে লেগে পড়ি।'

চন্দ্রেশ্বর বলল, 'সবকিছু ঠিকঠাক চললে আর মাত্র ক'টা দিন। তারপরই বাড়ি ফেরা। কতদিন যে বউয়ের হাতের রান্না খাইনি!'

সুজাতা ঠোঁট টিপে বলল, 'স্ত্রৈণ।'

চন্দ্রেশ্বর অবাক হয়ে তাকাল সুজাতার দিকে : 'কেয়া, ম্যাডাম, ইয়ে স্ত্রৈণ কেয়া হ্যায়?'

আমি হেসে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'ওটা দেবভাষা—তুমি ওর মানে বুঝবে না। ওই শব্দটার মানে হল, তুমি তোমার বউকে খুব ভালোবাসো।'

চন্দ্রেশ্বর খুশি হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল : 'ও তো সহি বাত।'

আমরা বাইরে বেরোতেই চন্দ্রেশ্বর বলল, 'ড্রিল-ডিউটিতে আপনি তো একা থাকবেন। যদি কোনও...ইয়ে...ডেঞ্জার হয়...মানে...।'

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমি একা দুজনের চেয়েও একটু বেশি। এই কথাটা আমি অফিশিয়ালি সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই। সুজাতা, তুমি সবাইকে এটা বলে দিয়ো। যদি খুনি আমাকে উধাও করার ঝুঁকি নেয় তা হলে দ্যাট উইল বি হেল অফ আ রিস্ক।'

চন্দ্রেশ্বর চোখ সরিয়ে নিল আমার চোখ থেকে।

তিন

সন্ধেবেলায় সবাই আড্ডার মেজাজে ছিলাম।

অদিতি বেশ কয়েকটা গান শোনাল। রোহিত সেই গানে কখনও-কখনও গলা মেলাল। চন্দ্রেশ্বর নানারকম নেশা করা নিয়ে অনেকগুলো মজার গল্প শোনাল। তারপর আমরা সবাই তাসের প্যাকেট নিয়ে বসলাম। ঘণ্টাখানেক ফিশ আর রামি খেলা হল।

সময়টা এমন হইহই করে কাটছিল যে, আমরা একরকম ভুলেই গেলাম, কী কাজে আমরা এসেছি, আর কী রহস্যময় বিপদে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।

হাসি, ঠাট্টা, আর মজায় সুজাতা অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠল। অদিতিও মনে হল পবনের করুণ পরিণতির ধাক্কাটা দিব্যি সামলে নিয়েছে।

রাত আটটা নাগাদ তুষারঝড় উঠল।

বিকেল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। এই ঝোড়ো হাওয়াটা ব্লিজার্ডের সুনিশ্চিত খবর নিয়ে আসে। সুতরাং আমরা তৈরি ছিলাম।

বিকেলে ড্রিল-হাউসে আমি কাজ করেছি। তবে আমি সতর্ক ছিলাম। হঠাৎ করে কেউ যদি আমাকে আক্রমণ করতে আসে তা হলে তাকে আমি অনায়াসেই চমকে দিতে পারব। একটা স্টেরিলাইজ্‌ড স্টেইনলেস স্টিলের কনটেনার আমার জ্যাকেটের ভেতরে লুকোনো আছে। তাতে রয়েছে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড। খুনি হোক কি বরফের পোকা হোক, কিংবা লেক এক্স-এর ভয়ঙ্কর সরীসৃপও যদি হয়, তাকে প্রাথমিকভাবে শায়েস্তা করতে পারবে এই অ্যাসিড। তারপর, প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় ধাপে, রয়েছে একটা বড় মাপের স্ক্রু ড্রাইভার। আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করলে খুনি হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারবে, আমি পবন শর্মা বা সুরেন্দ্র নায়েক নই। সূর্যদ্যুতি সেন আলাদা জিনিস।

ড্রিল ডিউটির সময় আমি ড্রিল-হাউসে আবার একদফা অনুসন্ধান চালিয়েছি। টর্চ হাতে নিয়ে কাঠের মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখেছি। তাতে সেরকম কিছুই পাইনি। শুধু জেনারেটরের পিছনে এক কোণে দু-তিনটে টুকরো পেয়েছি।

অনেকক্ষণ ধরে টুকরোগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝতে পেরেছি ওগুলো পাঁউরুটির টুকরো—শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সকালে ব্রেকফাস্টে আমরা টোস্ট, আখরোট আর কফি খেয়েছিলাম। কে জানে, তখন হয়তো অদিতি কিংবা সুরেন্দ্র ব্রেকফাস্ট সঙ্গে নিয়ে ড্রিল-হাউসে এসে ঢুকেছে। আবার গতকাল পবনও এসে থাকতে পারে। কিন্তু কাল পবন উধাও হওয়ার পর আমরা যে তল্লাশি চালিয়েছিলাম তাতে এগুলো পাওয়া যায়নি। তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, হয় আমরা কাল ভালো করে খোঁজ করিনি, অথবা আমাদের গতকালের তল্লাশির পর এগুলো কেউ এখানে ফেলে গেছে।

পাঁউরুটির কয়েকটা টুকরো ছাড়া ড্রিল-হাউসে আর কিছু পাইনি আমি। তবে ইচ্ছে করেই এগুলোর কথা কাউকে আর বলিনি।

সুজাতার কথায় আমার চটকা ভাঙল।

ও বলল, 'সূর্যদা, ব্লিজার্ড শুরু হয়ে গেছে...।'

রোহিত বলল, 'তার মানে কাজ বাড়ল। কাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা

শুধু বরফ সরানোর কাজ করতে হবে।'

আন্টার্কটিকার ঠান্ডা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। শীতের পোশাক পরে সেই ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিন্তু যদি কনকনে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে তা হলে শীতের পোশাক মোটেই আর যথেষ্ট নয়। তুষারঝড়ের সময় শনশনে হাওয়ায় উড়তে থাকে শুকনো বরফের কুচি—মরুভূমিতে যেমন বালির ঝড় ওঠে অনেকটা সেইরকম।

এই ঝড়ের সময় ক্যাম্পের বাইরে বেরোনোই মুশকিল। চামড়ার এতটুকু খোলা জায়গা পেলে বরফকুচির ঘায়ে সেখানে আঁচড় পড়বেই। মনে হয় যেন হাজার-হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে কেউ। তাঁবু কিংবা ক্যাম্পকে বাঁচাতে অনেক সময় ব্লিজার্ডের মধ্যেই আমাদের বাইরে বেরোতে হয়েছে। তখন যে-দৃশ্য দেখেছি তা জীবনে ভোলার নয়। অসংখ্য বরফের কুচি হাওয়ায় ভেসে ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে। সেই ঢেউয়ের মাঝে অন্ধের মতো হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা কয়েকজন—আমাদের ঘিরে ফেলেছে সাদা অন্ধকার।

আন্টার্কটিকায় এসে থেকে অনেক তুষারঝড় আমরা দেখেছি। ঝড়ের সময় আমরা এ পর্যন্ত হাওয়ার সবচেয়ে বেশি গতি পেয়েছি ঘণ্টায় একশো আশি কিলোমিটার।

আজকের ঝড়টার তেজ কম হলেও আমার কেমন অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমাদের পাঁচজনের ভেতরের ঝড় যেন হঠাৎই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

চন্দ্রেশ্বর আর রোহিতকে বললাম, ক্যাম্পের বাইরে জানলা আর দেওয়ালগুলো ভালো করে চেক করতে। এই উড়ন্ত বরফের মজা হল এই যে, ওরা যেখানেই ধাক্কা খায় সেখানেই লেপটে আটকে যায় আঠার মতো।

ওরা দুজনে সিনথেটিক দড়ি আর শাবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরোনোর আগে চোখ, মাথা, শরীর ভালো করে ঢেকে নিল। ওদের বললাম, রান্নাঘর আর স্টোরটায় ভালো করে নজর দিতে। কারণ, ক্যাম্পে ল্যাবগুলোর আমরা যতটা যত্ন নিই, রান্নাঘর বা স্টোরের বেলায় তার দশভাগের একভাগও নিই না।

অদিতি আর সুজাতাকে বললাম, 'তোমরা বসে গল্প করো—আমি

সবক'টা ঘর ঘুরে একবার দেখে আসি।'

মিনিটদশেকের মধ্যেই আমাদের কাজ সারা হয়ে গেল, কিন্তু দুরন্ত গতির ঝড়ের জন্যে মনে হল যেন একঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে।

গল্পগুজবে আরও খানিকটা সময় কেটে যাওয়ার পর সুজাতা হঠাৎ বলল, 'বেস ক্যাম্পে খবর পাঠাবেন না, সূর্যদা?'

রোহিত বলল, 'হ্যাঁ, সুরেন্দ্র উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানান...।'

সুজাতা বলল, 'আর লেক এক্স-এর ব্যাপারে বেস ক্যাম্পকে অ্যালার্ট করে দেবেন।'

'অ্যালার্ট করে দেব মানে!' আমি অবাক হয়ে সুজাতার মুখের দিকে তাকালাম। এই দুদিনে ওর বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। এক কাল্পনিক জলের সরীসৃপ আর বরফের পোকা ওকে কুরে-কুরে খাচ্ছে।

সুজাতা আমার চোখে তাকাতে সাহস পেল না। চোখ নামিয়ে বলল, 'এই যে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েক হাওয়ায় মিলিয়ে গেল...।'

আমি ভীষণ বিরক্ত হলাম। এইরকম একটা একঘেয়ে থিয়োরি আর কাঁহা তক শোনা যায়!

'শোনো, সুজাতা, লেক এক্স-এর সঙ্গে পবন আর সুরেন্দ্রর ডিস্যাপিয়ারেন্সের কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি যে বলছ দুটো ব্যাপার কানেক্টেড...তার কোনও প্রমাণ তুমি পেয়েছ?'

সুজাতা চুপ করে রইল। তবে মুখের ভাবে বোঝা গেল আমার কথা ও মানতে রাজি নয়।

'শোনো...' আমি বলে চললাম, 'ওদের উধাও হওয়ার নিশ্চয়ই কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। মানে...।'

'সত্যিকারের আছে কি?' বলল চন্দ্রেশ্বর, 'দু-দুটো মানুষ পরপর দু-দিন হুউস করে উধাও হয়ে গেল। তাদের আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। এর পেছনে কোথায় যুক্তি কোথায় কারণ! বস, ডোন্ট মাইন্ড, খুব অবাস্তব শোনালেও বেস ক্যাম্পকে লেক এক্স ফ্যাক্টরটার কথা বলা দরকার।'

সুজাতা ধীরে-ধীরে বলল, 'এরপর...বেশি দেরি হয়ে গেলে...খবরটা দেওয়ার জন্যে আমরা কেউই হয়তো আর থাকব না।'

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। রোহিত, চন্দ্রেশ্বর, আর সুজাতা—ওরা চায় যতই উদ্ভট হোক, বেস ক্যাম্প লেক এক্স-এর ভয়ের ব্যাপারটা জানুক। বাকি রইলাম আমি আর অদিতি। অদিতির কী মত কে জানে! আমাদের প্রজেক্ট প্রায় শেষ—হয়তো কালই বরফ কেটে জলের সন্ধান পাবে ড্রিল। এরকম একটা সময়ে এইরকম বিতর্ক আমার ভালো লাগছিল না।

শেষ পর্যন্ত ভি এইচ এফ ট্রান্সমিটারে খবর পাঠাতে বসলাম।

বেস স্টেশনের রেডিয়ো অপারেটর ঘুম-জড়ানো গলায় আমাদের ডাকে সাড়া দিল। আমি জানালাম যে, আমাদের টিমের আর-একজন, সুরেন্দ্র নায়েককে পাওয়া যাচ্ছে না।

খবরটা পেয়েই অপারেটরের ঘুম কেটে গেল।

আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা জানালাম। বললাম যে, আমাদের এখানে ব্লিজার্ড চলছে।

উত্তরে সে বলল, ওখানেও তুষারঝড় এখনও থামেনি।

আমার পাশে ছিল রোহিত। আর রোহিতের পাশে সুজাতা। আমি মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, লেক এক্স-এর উদ্ভট থিয়োরির কথা বেস স্টেশনকে জানাব না। ওরা হয়তো ভাববে আমরা পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু সেটা আর হল না।

কারণ, হঠাৎই সুজাতা রোহিতকে ডিঙিয়ে ট্রান্সমিটারের ওপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলল ওই অবাস্তব থিয়োরির কথা। বলতে-বলতে আবেগে ভয়ে ও কাঁদতে শুরু করল। এবং কথা শেষ করেই বলে দিল, 'ওভার অ্যান্ড আউট'। ফলে রেডিয়ো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আমরা পাঁচজন চুপচাপ বসে রইলাম। বেস স্টেশন এখন কী ভাববে কে জানে! আবার রেডিয়ো যোগাযোগ করে সুজাতার কথা যে পাগলের প্রলাপ সেটা বলাটা ঠিক হবে না। ওরা ভাববে দলের ওপরে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি।

সুজাতা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ওর ওপরে রাগ করে কোনও লাভ নেই। ওর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।

রাতে আমরা যখন খেতে বসলাম তখন তুষারঝড় প্রায় থেমে গেছে।

সারা রাত ভালো ঘুম হল না।

স্লিপিং ব্যাগে এপাশ-ওপাশ করে আর নানান দুঃস্বপ্ন দেখে রাত কাটল। ভোরবেলায় শেষ যে-স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভাঙল সেটা বেশ বিচিত্র।

একটা লেপার্ড সিল একটা অ্যাডেলি পেঙ্গুইনকে একেবারে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে নিরীহ প্রাণীটা বুকে ভর দিয়ে ডানা দিয়ে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে বরফের ওপর দিয়ে পিছলে পালাচ্ছে। আর বরফের ওপরে রেখে যাচ্ছে রক্তের দাগ। স্তিমিত সূর্যের আলো বরফের মসৃণ তল থেকে ঠিকরে পড়ছে। সেই আলোয় রক্তের দাগটাকে অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

তখনই আইডিয়াটা আমার মাথায় এল। ঘুমও ভেঙে গেল একইসঙ্গে।

ঠিক করলাম, বিষয়টা নিয়ে অদিতির সঙ্গে গোপনে কথা বলব। উকিলসাহেবের বুক থেকে যে-রক্তের দানাগুলো আমি তুলে নিয়েছিলাম সেগুলো এখনও আমার কাছে যত্ন করে রাখা আছে। এখনও আমার ধারণা ওগুলো পবনের রক্ত। ধারণা কেন, প্রায় সুনিশ্চিত বিশ্বাস, কারণ, উকিলসাহেবকে দেখে আমার আহত বলে মনে হয়নি।

অদিতি যদি ওই রক্ত পরীক্ষা করে আমাকে বলে যে, ওটা মানুষের রক্ত—পেঙ্গুইনের নয়, তা হলে আমি ধরে নেব পবন খুন হয়েছে, সুরেন্দ্রও। এরপর কার পালা কে জানে!

গ্যাসের উনুন জ্বেলে রোজই আমাদের জল তৈরি করে নিতে হয়। খাওয়ার জল, মুখ ধোওয়ার জল, বাসনমাজার জল—সবই পাওয়া যায় বরফ গলিয়ে। যেহেতু গ্যাস খরচ কম হওয়াটাই ভালো, সেহেতু জলের বরাদ্দ মাথা পিছু মাপা—এক কাপ কি বড়জোর দু-কাপ। আর স্নানের তো কোনও প্রশ্নই নেই!

ঘুম থেকে উঠে বরাদ্দ জলে হাত-মুখ ধুয়ে চলে গেলাম ব্রেকফাস্ট টেবিলে। বাকি চারজন তখন বড় প্লাস্টিকের কাপে করে কফি খাচ্ছে।

ওদের দেখামাত্রই প্রথম যে-কাজটা আমার মন করে বসল সেটা হল আদমসুমারি। কাল রাতে আমরা পাঁচজন ছিলাম, আজ সকালেও পাঁচজন আছি তো!

স্যান্ডউইচ, আলুভাজা, কাজুবাদাম আর কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার সময় মনেই হল না বাড়ি থেকে বহু দূরে বরফের মহাদেশে বসে আছি।

রোহিত তখন সুজাতাকে আইসবার্গের গল্প বলছিল।

বিজ্ঞানী হিসেবে সুজাতার বহু তথ্য জানা থাকলেও মন দিয়ে শুনছিল রোহিতের কথা। এতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিটা অন্তত খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যাবে।

আইসবার্গের মাপের কথা বলতে গিয়ে রোহিত বলল, 'এক-একটা আইসবার্গ লম্বায় কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আর এর হাইট গড়ে কয়েক কিলোমিটার। প্রথম যখন বরফের স্তরটা নিজের ভারে আইস শেল্‌ফ থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসে তখন এই ভাঙা টুকরোগুলোর চেহারা থাকে একেবারে টেবিলের মতো ফ্ল্যাট। ওরকম আইসবার্গ তো এখানে আসার সময় দেখেছ! তারপর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে আইসবার্গগুলো ক্ষয়ে যায়, ওদের চেহারা পালটায়। ভেসে যাওয়ার পথে এলোমেলো জলের ঝাপটায় ওদের গায়ে বিচিত্র সব শেপের গুহা তৈরি হয়। কখনও তৈরি হয় বরফের ছুঁচলো পিক, কখনও বা আর্চ—দেখে মনে হতে পারে ঠিক যেন কাচের তৈরি রাজপ্রাসাদ।'

রোহিত একটু দম নেওয়ার জন্যে থামতেই সুজাতা বলল, 'কই, আমরা তো অত সুন্দর আইসবার্গ দেখিনি!'

উত্তরে মুচকি হাসল রোহিত ঃ 'ওসব দেখার জন্যে ভাগ্য চাই, ভাগ্য! আমি এই এরিয়ার সমুদ্রে বহু ঘুরেছি—কত সুন্দর-সুন্দর চেহারার আইসবার্গ দেখেছি। দেখেছি আইসবার্গের ওপরটা ক্ষয়ে গর্ত হয়ে যাওয়ার পর তার ভেতরে বরফ গলে মিষ্টিজলের ছোট্ট পুকুর তৈরি হয়েছে। আর সেই পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছে অ্যালবাট্রস—যাকে সিন্ধুসারস বলে।

'এইসব দেখে আমার খুব সাধ হত আইসবার্গে চড়ে সমুদ্রে ভেসে



বেড়াতে। এইভাবে বেড়াতে-বেড়াতে একদিন হয়তো গোটা পৃথিবীটাই চক্কর মেরে আসতাম। ভাবো তো, কী থ্রিলিং!'

অদিতি কফির মগে লম্বা চুমুক দিয়ে মন্তব্য করল, 'তদ্দিনে তোমার আইসবার্গ গলে জল হয়ে যেত।'

রোহিত কফি শেষ করে হাতে-হাত ঘষল কয়েকবার, তারপর বলল, 'না, ম্যাডাম, বড়-বড় আইসবার্গ সহজে গলে জল হয় না। পুরোপুরি গলে জল হতে ওগুলো প্রায় দু-বছর কি তার বেশি সময় নেয়। ভাবুন তো, ঈশ্বরের কী অদ্ভুত লীলা—নোনা সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মিষ্টি জলের পাহাড়! যেসব জায়গায় খাওয়ার জলের খুব অভাব সেখানে যদি কোনওভাবে এইসব পাহাড় পৌঁছে দেওয়া যেত! যেমন ধরুন, আরবদেশগুলোর মতো শুকনো জায়গায় যদি আন্টার্কটিকা থেকে আইসবার্গ কয়েকটা টাগবোট দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে কেমন মজা! সমুদ্রপথে এই ডিসট্যান্সটা হবে প্রায় আটহাজার কিলোমিটার মতো, আর নিয়ে যেতে সময় লাগবে বড়জোর একবছর। যদি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আইসবার্গগুলোর ওপরটা পাতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে নেওয়া হয়, তা হলে বরফ গলবে অনেক কম। আর প্লাস্টিকের আড়ালে কিছুটা করে বরফ গলে তৈরি হয়ে যাবে মিঠে জলের হ্রদ। সেখান থেকে সরাসরি পাম্প করে মরুভূমির কোস্টাল এরিয়াতে দিব্যি জল পাঠানো যাবে।'

'তবে যা-ই বলো, এতে অনেক খরচ পড়ে যাবে।' অদিতি বলল।

অদিতি ওর বিষয়ের বাইরেও অনেক খোঁজখবর রাখে। আইসবার্গ নিয়ে এত কথা আমারও জানা ছিল না। আমি শুধু জানি, পানীয়জলের অভাব মেটাতে আরবের দেশগুলোতে বিশবছর আগে একটা 'ডিস্যালিনেশন প্রজেক্ট' নেওয়া হয়েছিল। এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমে সমুদ্রের নোনাজল থেকে নুন বের করা। তারপর নুনবিহীন জলকে সমুদ্রতীরের কাছাকাছি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের 'কুলিং ওয়াটার' হিসেবে ব্যবহার করা। এর পরের ধাপের কাজ ছিল সেই 'কুলিং ওয়াটার'-কে প্রসেস করে 'ড্রিঙ্কিং ওয়াটার' তৈরি করা। তবে শেষ পর্যন্ত সেই প্রজেক্ট খুব একটা লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়নি।

রোহিত মাথা নেড়ে অদিতির কথায় সায় দিল ঃ 'হ্যাঁ, খরচ পড়বে বটে, তবে ইট্‌স আ নভেল পসিবিলিটি।' তারপর একটু সময় নিয়ে বলল,

'আরও একটা নভেল পসিবিলিটির কথা সায়েন্টিস্টরা ভেবেছে—আন্টার্কটিকাকে ন্যাচারাল কোল্ড স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না...।'

ব্যাপারটা নিয়ে বিদেশি পত্রপত্রিকায় কয়েকটা লেখা আমার চোখে পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছে, পৃথিবীর বাড়তি খাদ্য-শস্য যদি জাহাজে করে আন্টার্কটিকায় নিয়ে এসে সঞ্চয় করে রাখা যায়, তা হলে এর বিশুদ্ধ হিমশীতল পরিবেশে সেগুলো একটুও নষ্ট হবে না। তারপর, দরকার মতো, সেইসব খাদ্য-শস্য এখান থেকে নিয়ে গিয়ে খরচ করা যেতে পারে। এতে সারা পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের সমস্যা আর থাকবে না।

তবে এই কাজের পথে এখনও পর্যন্ত একটাই বাধা—খরচ।

চন্দ্রেশ্বর চুপচাপ বসে রোহিতের কথা শুনছিল। ও কফি শেষ করে মুখে মশলাপাতি কিছু একটা পুরে দিয়ে জাবর কাটছিল। হঠাৎই জড়ানো গলায় বলল, 'সুনিয়ে কোশ্চেন জোড়ি, আইসবার্গ নিয়ে আমিও কুছু-কুছু জানি।'

ওর কথা বলার ধরনে অদিতি আর সুজাতা তো হেসে কুটিপাটি।

সুজাতা হেসে জিগ্যেস করল, 'তা কী সেই কুছু-কুছু জানতে পারি?'

'আলবাত! তখন থেকে দেখছি তোমরা রোহিতের দিকে ধেয়ান দিয়ে বসে আছ...।'

রোহিত বলল, 'চন্দ্রেশ্বর, তোমাকে ভাই আমি একটুও ঈর্ষা করি না।'

'ঈর্ষা?' চন্দ্রেশ্বর অবাক হয়ে রোহিতের দিকে তাকাল ঃ 'ঈর্ষা মানে কী?'

আমি কপাল চাপড়ে বললাম, 'ওঃ, আবার সেই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম!'

অদিতি চন্দ্রেশ্বরকে বলল, 'ওসব ছাড়ো—তোমার আইসবার্গের গল্প শোনাও।'

চন্দ্রেশ্বর হাসল। উৎসাহ পেয়ে জাবর কাটা থামিয়ে ওর 'কুছু-কুছু' শুরু করল।

'টাইটানিকের নাম সবাই শুনেছ তো! লাক্সারি লাইনার টাইটানিক...।'

সুজাতা ফস করে বলে উঠল : 'ও গল্প সবার জানা।'

চন্দ্রেশ্বরের উৎসাহ দপ করে নিভে গেল। মুখে ফুটে উঠল বেজার ভাব। দুজন তরুণীর মনোযোগ পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়-হয় দেখে মরিয়া হয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল সুজাতার দিকে : 'বলো তো কী জানো?'

সুজাতা হার-না-মানা ভঙ্গিতে বলল, 'আইসবার্গে ধাক্কা লেগে টাইটানিক জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে জাহাজটা আমেরিকা যাচ্ছিল। ওটাই ছিল ফার্স্ট ভয়েজ।'

চন্দ্রেশ্বর অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, 'ব্যস? স্টোরি খতম? বলো তো, অ্যাক্সিডেন্টটা কবে হয়েছিল, ক'জন মারা গিয়েছিল?'

আমি সুজাতাকে বললাম, 'তুমি বড় ডিসটার্ব করো, সুজাতা। চন্দ্রেশ্বরের মুড এসে গেছে, ওকে বলতে দাও।'

সুজাতা এক অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাল। ধীরে-ধীরে বলল, 'আপনি বলছেন, তাই চুপ করে যাচ্ছি। আপনি আমার বস।'

কেন জানি না, মনে হল, শেষ লাইনটা ও অন্যরকমভাবে বলল। আমার চোখ থেকে চোখ এতটুকুও সরাল না। আর কেউ সেটা লক্ষ করল কি না কে জানে!

টাইটানিকের গল্পটা বলার জন্যে অদিতি চন্দ্রেশ্বরকে তাগাদা করল। চন্দ্রেশ্বর কয়েকবার জাবর কেটে বলতে শুরু করল।

'ইয়ারটা ছিল নাইনটিন টুয়েলভ, ফোর্টিন্থ এপ্রিল। সেদিন রাতে নিউফাউন্ডল্যান্ডের কাছে একটা আইসবার্গের সঙ্গে টাইটানিকের কলিশন হয়। ওই অ্যাক্সিডেন্টে পরদিন ভোরবেলা টাইটানিক ডুবে যায়। তার সঙ্গে প্যাসেঞ্জার আর ক্রু মিলিয়ে মোট পনেরোশো তেরোজন মানুষও ডুবে মারা যায়। তারপর থেকে নর্থ অ্যাটলান্টিকের শিপিং লেনের আইসবার্গ ডেঞ্জার জোনগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল আইস প্যাট্রল চালু করা হয়। প্যাট্রল ভেসেল থেকে অন্যান্য জাহাজে রেডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে বিপজ্জনক আইসবার্গ আর প্যাক আইসের খবর জানানো হয়। তাতে টাইটানিকের মতো ট্র্যাজিক অ্যাক্সিডেন্টের পসিবিলিটি অনেক কমে গেছে।'

রোহিত বলল, 'দাদা, টাইটানিককে ক'বছর আগে স্যালভেজ করা হয়েছে না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ১৯৮৫ সাল থেকে স্যালভেশানের কাজ শুরু

হয়েছিল। সে-বছর ''অ্যালভিন ব্যাথিস্ফিয়ার'' ব্যবহার করে টাইটানিকের বয়লারের কিছু অংশ উদ্ধার করা গিয়েছিল। এরপর ১৯৮৭-তে টাইটানিকের প্রায় দেড়শো জিনিস জল থেকে তোলা হয়েছিল। নাও, এখন বরফের গল্প ছেড়ে বডি তোলো—বাইরে গিয়ে বরফ সরানোর কাজ করতে হবে। চলো, চলো—।'

খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে অদিতি বলল, 'আর দু-একদিনের মধ্যেই আমরা আন্টার্কটিকা ছেড়ে চলে যাব। তো স্মৃতি হিসেবে এখান থেকে বরফ ছাড়া আর কিছু নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই—তাও আবার যাওয়ার পথে গলে জল হয়ে যাবে।'

সুজাতা উৎসাহী খুকির মতো বলে উঠল, 'আর নিয়ে যাওয়া যেত পেঙ্গুইন। আমার দিদির ছেলেটা বারবার করে বলে দিয়েছে, ''মাসি, একটা বাচ্চা পেঙ্গুইন তোমাকে নিয়ে আসতেই হবে—কোনও কথা শুনব না।'' কিন্তু...' সুজাতার মুখটা মনখারাপগোছের হয়ে গেল। বেজারভাবে বলল, 'কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই! পেঙ্গুইন আন্টার্কটিকার বাইরে সহজে বাঁচে না।'

'কেন?' রোহিত জিগ্যেস করল।

'এক নম্বর কারণ হল, ওরা ভীষণ ঠান্ডা ছাড়া থাকতে পারে না। আর দু-নম্বর হল, এই বিশুদ্ধ পরিবেশে থেকে ওরা এমন হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে যে, ওদের রোগজীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে, এই অঞ্চলের বাইরে গেলেই ওরা রোগজীবাণুর আক্রমণে মারা পড়ে। এককথায়, বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া প্র্যাকটিক্যালি ইমপসিব্‌ল। তাই ভাবছি কী নিয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওই জলই নিয়ে যেতে হবে।'

ক্যাম্প থেকে বেরোতে-বেরোতে চন্দ্রেশ্বর বলল, 'এই ''জল! জল!'' করেই আমাদের মাথা জল হয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিকই বলেছ—সরকারের লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা এই অভিযানে এসেছি স্রেফ একটু জলের জন্যে।'

সুজাতা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল।

বাইরে বেরিয়ে প্রথমে শুরু হল তুষারঝড়ের বরফ সরানোর কাজ। বেলচা, গাঁইতি, কোদাল—যা পারলাম কাজে লাগালাম। অতিরিক্ত

পরিশ্রমে জ্যাকেটের ভেতরে জামা ঘেমে যেতে লাগল। তখন আমরা ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে আগে জামা শুকিয়ে নিতে লাগলাম—নইলে ঘামে ভেজা জামা জমে শক্ত হয়ে যাবে।

আমার নাক দিয়ে সর্দি গড়িয়ে পড়ছিল। গ্লাভ্‌সের পিঠ দিয়ে নাক মুছতে গিয়ে টের পেলাম গোঁফের কাছটা জ্বালা করছে। কনকনে ঠান্ডায় হাতের আঙুল অসাড় হয়ে আসছিল। তখন ক্যাম্পে ঢুকে গ্লাভ্‌স খুলে হাতে হাত ঘষেছি। আঙুল বারবার মুঠো করে আর খুলে জমাট ভাবটা কাটিয়েছি।

প্রায় দু-ঘণ্টা অমানুষিক খাটুনির পর ক্যাম্প, ড্রিল-হাউস, আর অদিতির তাঁবু বরফ সরিয়ে ঠিকঠাক করা হল। তখন আমি বললাম, 'এখন একমগ করে গরম-গরম চিকেন সুপ না হলে চলছে না। সুপ খেয়ে তারপর ড্রিল চালু করব।'

সঙ্গে-সঙ্গে অদিতি বলল, 'আমি কিচেনে গিয়ে গ্যাস জ্বালছি, আপনি স্টোর থেকে সুপের ক্যান নিয়ে আসুন।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি।' বলে আমি স্টোরের দিকে পা বাড়ালাম।

আমাদের স্টোর আর রান্নাঘরের দুটো করে দরজা ঃ একটা বাইরের দিকে, আর-একটা ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে। রান্নাঘরের বাইরের দরজাটা বেশিরভাগ সময়েই বন্ধ থাকে—শুধু বাসনপত্র ধোওয়ার সময় খোলা হয়। তবে স্টোরের বাইরের দরজাটা আমরা ব্যবহার করি বেশি। এখানে চুরি-চুরির কোনও ভয় নেই বলে দরজাগুলো স্রেফ শেকল দিয়ে আটকানো থাকে।

বাইরের দরজার শেকল খুলে আমি স্টোরে ঢুকলাম।

বেশ বড় মাপের স্টোর রুম মালপত্রে বোঝাই। আমরা এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেলে পরের অভিযাত্রী দল এখানে আসবে। এখন আন্টার্কটিকার বেশিরভাগ ক্যাম্পই একাধিক টিম ব্যবহার করে—গ্রীষ্মের টিম, আর শীতের টিম। তবে যে-ক্যাম্পকে বাতিল করে দেওয়া হয় সেটা ভুতুড়ে বাড়ির মতো পড়ে থাকে—তুষারঝড়ের প্রবল ঝাপটার সঙ্গে মোকাবিলা করে যে-ক'দিন পারে টিকে থাকে। আমাদের ক্যাম্পে শীতের দল আসবে, তারপর আবার গ্রীষ্মের দল। আপাতত সেইরকমই ঠিক আছে।

সুইচ টিপে স্টোর রুমের আলো জ্বাললাম।

একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে খাবারের ক্রেট, টিন আর প্যাকিং বক্স। প্রায় ঘরের চাল পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে—লোড করা ফুল পাঞ্জাব ট্রাক যেমন দেখতে হয়। আর তার ঠিক বিপরীতদিকে নানান যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট, ট্রান্সফর্মার, ট্রান্সমিটার, শাবল, গাঁইতি, আইস অ্যাক্স, সিনথিটিক দড়ি, তাঁবু, পোশাক-আশাক, তিনটে স্নোমোবাইল গাড়ি—আরও কত কী!

আমি খাবারের স্টোরের কাছে গেলাম। চিকেন সুপের কৌটোগুলো খুঁজতে লাগলাম।

হঠাৎই দেখি, নিচের দিকে অনেকগুলো বাক্স একটু অগোছালো এবং বিপজ্জনকভাবে বাইরে বেরিয়ে আছে। গতকালও এরকম অগোছালো ব্যাপারটা ছিল না। তা ছাড়া খাবারের বাক্সগুলো একটু যেন অন্যরকমভাবে সাজানো।

মনে হল, ওগুলো ঠিক করে না সাজালে পড়ে গিয়ে ছত্রখান হয়ে যেতে পারে।

দলের প্রত্যেকেই জানে, আমি একটু খুঁতখুঁতে মানুষ—সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসি। তাই ওরা সকলেই গুছিয়ে কাজ করাটা অভ্যেস করে নিয়েছে।

তা হলে এই ব্যাপারটা কেমন করে হল!

স্বভাব যায় না মলে!

তাই বাক্সগুলোর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওগুলো টেনেটুনে ঠিকঠাক করে সাজাতে চাইলাম।

আর ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

একগাদা টিন, ক্রেট আর প্যাকিং বক্স হুড়মুড় করে পড়তে লাগল আমার ঘাড়ে।

ভাগ্যিস নিচের বাক্সগুলোর টাল খেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি একপলক আগে টের পেয়েছিলাম! তাই সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি পাঁচ হাত দূরে কাঠের মেঝেতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোপুরি আঘাত এড়াতে পারলাম না। একটা ভারী ক্রেট ডান কাঁধের ওপরে এসে পড়ল। বেশ কয়েকটা টিনের বাক্স খসে পড়ল মাথায়। মাথার ওপরে একটা জায়গা ব্যথায় টনটন করতে লাগল, সেইসঙ্গে জ্বালাও টের পেলাম। বোধহয় মাথা

ফেটে গেছে।

শব্দ শুনে অদিতি ছুটে এল রান্নাঘর থেকে। ওর পেছন-পেছন এল চন্দ্রেশ্বর, রোহিত আর সুজাতা।

'কী হয়েছে, সূর্যদা!' সুজাতা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

রোহিত 'কী হল, দাদা?' বলে ছুটে এল আমার কাছে। আমাকে হাত ধরে তুলল।

ততক্ষণে অদিতি আমার কাছে এসে বেশ দুশ্চিন্তার গলায় জানতে চাইল, 'কোথাও লাগেনি তো? দেখি...।'

আমি মাথায় হাত দিয়ে যন্ত্রণায় 'উঃ' করে উঠলাম।

চন্দ্রেশ্বর আমার মাথার চুল সরিয়ে কাটা জায়গাটা দেখতে চাইল : 'লেট মি হ্যাভ আ লুক, বস।'

ওর পাশে উদ্বিগ্ন মুখে সুজাতা : 'দেখি, সূর্যদা, কোথায় লেগেছে?' ও আমার মাথার চুল সরিয়ে ক্ষতচিহ্নটা খুঁজতে লাগল।

শেষপর্যন্ত সুজাতা আর চন্দ্রেশ্বর মিলে আমার প্রাথমিক চিকিৎসা করল। আমি হতভম্ব ভাবটা কাটাতে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম। তারপর ঠান্ডা মাথায় বুঝতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা ঠিক কী হল।

অদিতি বলল, 'আপনার একটা বিরাট ফাঁড়া কেটে গেছে! আর-একটু হলেই বিচ্ছিরিরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হত।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?' আমি অদিতির চোখে তাকালাম। আচ্ছা, মেয়েটা কি এতই বোকা! এখনও বুঝতে পারেনি?

এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়—আমাদের কাউকে খুন করার চেষ্টা। সেইজন্যেই খুনি ওরকম ফাঁদ পেতেছিল। নিচের দিকে খাবারদাবারের খালি টিন আর বাক্সগুলো রেখে তার ওপরে ভরতি ভারি বাক্সগুলো চাপিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে একটা মরণফাঁদ পেতেছিল সে।

কিন্তু আমাদের নজর এড়িয়ে এতগুলো বাক্স কি খুনির পক্ষে নাড়াচাড়া করা সম্ভব? তাই যদি হয় তা হলে খুনির গায়ে অনেক জোর থাকা দরকার, আর হাতে অনেক সময়।

মনের সন্দেহের কথা অদিতিকে বলতেই ও বলল, 'হতে পারে, সূর্যদা। কাল রাতে এই আড়াইটে-তিনটেনাগাদ আমি স্টোর রুম থেকে শব্দ পেয়েছিলাম। ভাবলাম, বোধহয় আমাদেরই কেউ স্টোর রুমে স্লিপিং

ব্যাগের খোঁজে গেছে—তাই আর উঠে দেখিনি।'

অদিতির কথায় রোহিত বলল যে, হ্যাঁ, ও-ও ওইরকম শব্দ শুনেছে, তবে তখন ও ঘড়ি দেখেনি বলে সময়টা ঠিক বলতে পারবে না।

কিন্তু ওরা আমাকে এসব কথা আগে বলেনি কেন কে জানে!

আমার আঘাত সেরকম গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু খুনির সাহস আর স্পর্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত ক্রেট, টিন, আর বাক্সগুলোকে টেনে-টেনে আবার সাজিয়ে রাখতে লাগল। অদিতি আর সুজাতা রান্নাঘরের দিকে গেল চিকেন সুপ তৈরি করতে।

একটু পরে গরম-গরম চিকেন সুপ খেয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। স্টোর রুমের কাজ সেরে এসে রোহিত আমাকে বলল, 'দাদা, ড্রিল ডিউটিতে আমি যাচ্ছি।'

আমি বললাম, 'এখন আমরা সবাই ড্রিল-হাউসে যাব। কারণ, আমার ধারণা, আজ দু-একঘণ্টার মধ্যেই আমরা বরফ কেটে লেক এক্স-এর জলে পৌঁছে যাব।'

রোহিত বলল, 'আমি আর চন্দ্রেশ্বর গিয়ে মেশিনটা স্টার্ট করি—আপনারা পরে আসুন।'

অগত্যা রাজি হতেই হল।

রোহিত ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রেশ্বর খইনি টিপতে-টিপতে ওর পিছু নিল।

ওরা চলে যেতেই অদিতিকে আমি কাছে ডাকলাম। সুজাতা তখন বাসন-কোসন ধোওয়ার কাজে ব্যস্ত।

অদিতিকে রক্ত পরীক্ষার কথাটা জানালাম। বললাম, ব্যাপারটা যেন বাকি তিনজন কিছুতেই না জানতে পারে।

অদিতি ভেতরে-ভেতরে অবাক হলেও মুখে সেরকম কোনও ভাব প্রকাশ করল না। শুধু ঘাড় নেড়ে বলল, 'আজকেই করে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও আবার বলল, 'এখানে আর ভালো লাগছে না। এরকম সন্দেহ আর বিপদ মাথায় নিয়ে কখনও একসঙ্গে থাকা যায়!'

আমি বললাম, 'বেশি নয়, আর একটা কি দুটো দিন...জলের

স্যাম্প্‌ল হাতে পাওয়ামাত্রই আমরা দক্ষিণ গঙ্গোত্রীকে খবর পাঠাব।'

'কী আর করা যাবে' ভঙ্গিতে হাত নাড়ল অদিতি।

এমন সময় সুজাতা হাতের কাজ সেরে ঘরে এল। বলল, 'সূর্যদা, আমাদের এখানকার কাজ তো মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে, আজ বিকেলে তা হলে একটু বেড়াতে বেরোব?'

আমি আর অদিতি হেসে ফেললাম।

আমি বললাম, 'এখানে কোথায় বেড়াতে বেরোবে?'

'কেন, স্নোমোবাইলে চড়ে ওই পেঙ্গুইন রুকারিটায় যাব। পেঙ্গুইনদের ছবি তুলব। আমার দিদির ছেলেটাকে সত্যি-পেঙ্গুইন না দিতে পারি, অন্তত পেঙ্গুইনের ফটোগ্রাফ তো দিতে পারব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন তো, সূর্যদা?'

গত পাঁচমাসে পেঙ্গুইন রুকারিতে আমরা দুবার গেছি। কারণ, শুধু-শুধু স্নোমোবাইলের তেল পোড়ানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু এখন অভিযান বলতে গেলে প্রায় শেষ। ফলে এখন আর অত হিসেব করে চলার দরকার নেই। বেড়ানোর মুডে ওখানে একবার যাওয়া যেতেই পারে।

সুতরাং সুজাতাকে বললাম, 'হয়তো কাল-পরশুই আমরা এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাব। অতএব, অন্তত একবার বেড়াতে বেরোনোটা আমাদের পাওনা। তোমার কথাই রইল...তবে আজ নয়, কাল। কী, রাজি তো?'

সুজাতা ছোট্ট মেয়ের মতন ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড় নাড়ল। ও রাজি। ও কৃতজ্ঞতার চোখে আমার দিকে তাকাল।

সুজাতাকে বেশ স্বাভাবিক আর হাসিখুশি লাগছিল। বোধহয় অনেক চেষ্টার পর ভয়টাকে ও মন থেকে তাড়াতে পেরেছে। ওকে খুশি দেখে আমার ভালো লাগছিল।

ওকে বললাম, 'তুমি ড্রিল-হাউসে যাও...আমি আর অদিতি একটু পরে যাচ্ছি।'

ও চলে যেতেই অদিতিকে নিয়ে আমার ঘরে এলাম।

ঘরের এককোণে অনেক স্যাম্প্‌ল ব্যাগ আর কনটেনার রাখা ছিল। তা থেকে একটা স্যাম্প্‌ল ব্যাগ তুলে নিলাম। ব্যাগটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখলাম। রক্তের দানাগুলো চিকচিক করছে।

ব্যাগ থেকে দুটো দানা বের করে আর-একটা স্যাম্প্‌ল ব্যাগে

ভরলাম। সেটা অদিতিকে দিয়ে বললাম, 'তোমার টেস্ট করা হয়ে গেলে তুমি ওরিজিনাল স্যাম্প্‌লের কয়েকটা স্লাইড আমাকে দেবে। এখানকার রিপোর্টের সঙ্গে ওগুলো আমাকে হেডকোয়ার্টারে জমা দিতে হবে।'

অদিতি ঘাড় নেড়ে বলল, 'আজ বিকেলের মধ্যেই রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।'

'এবার চলো, ড্রিল-হাউসে যাই।'

ও স্যাম্প্‌ল ব্যাগটা ল্যাবে রেখে চট করে ফিরে এল, বলল, 'চলুন...।'

ক্যাম্পের বাইরে বেরোনোমাত্রই আমরা একটা ধাক্কা খেলাম ঃ ড্রিলের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু চাপা গরগর আওয়াজে জেনারেটর চলছে।

আমি আর অদিতি ড্রিল-হাউসের দিকে এগোচ্ছি, ঠিক তখনই চন্দ্রেশ্বর আর সুজাতা ছুটে বেরিয়ে এল ড্রিল-হাউসের বাইরে। দু-হাত শূন্যে তুলে চন্দ্রেশ্বর চেঁচিয়ে বলল, 'বস, উই হ্যাভ মেড ইট। হিপ হিপ হুররে!'

আমি আর অদিতি প্রায় ছুটে গেলাম ওদের দিকে।

সুজাতা চিৎকার করে বলল, 'সূর্যদা, শেষপর্যন্ত আমরা জিতেছি। উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড হিস্ট্রি।' তারপর ছুটে এসে আমাকে বুকে জাপটে ধরল, আনন্দে কী একটা বলতে গেল, কিন্তু আবেগে কেঁদে ফেলল।

বুঝলাম, ড্রিল কেন থেমে গেছে। ক্যাম্পের ভেতরে আমি আনমনা হয়ে কথা বলছিলাম বলে বুঝতে পারিনি ড্রিলের শব্দ কখন থেমে গেছে।

আমি সুজাতার পিঠ চাপড়ে 'শাবাশ!' বললাম। তারপর ওকে ধরে নিয়ে গেলাম ড্রিল-হাউসে।

সেখানে রোহিত তখন একমনে কাজ করছে। আমাদের দেখেই ও বলল, 'পৃথিবীতে আমরাই প্রথম লেক এক্স-এর জল টাচ করলাম। আমরা ইতিহাসের পাতায় ঢুকে গেলাম।'

অদিতি শুধু চাপা গলায় বলল, 'ইট্‌স আনবিলিভেব্‌ল! ফ্যানট্যাস্‌টিক!'

সুজাতা আমাকে ইশারায় কাছে ডাকল। ড্রিল করে তোলা স্যাম্প্‌লগুলো উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখাল।

স্যাম্প্‌ল কনটেনারগুলো পরপর সাজিয়ে রাখা। তাতে বরফের

পাশাপাশি রয়েছে হলদে কাদা-কাদা একটা পদার্থ—বরফ, জল আর লুব্রিক্যান্টে মাখামাখি। আর তার পাশেই দুটো কনটেনারে রয়েছে বাদামি রঙের ঘোলাটে জল—লেক এক্স-এর জল।

আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠে কনটেনারগুলোর ওপরে ঝুঁকে পড়লাম। তারপর চোখ কপালে তুলে সুজাতাকে প্রশ্ন করলাম, 'রেপটাইল আর আইসওয়র্মগুলো কোথায় গেল?'

আমার ঠাট্টাটা বুঝতে সুজাতার কয়েক সেকেন্ড দেরি হল। তারপর মুচকি হেসে মুখ নামিয়ে বলল, 'সরি, সূর্যদা!'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম : 'সুজাতা, এখন সরি-টরির সময় নয়। এখন শুধু আনন্দের সময়। এসো, হাতের কাজগুলো আগে সেরে নিই, তারপর সেলিব্রেট করা যাবে।'

আমরা সবাই মিলে কাজে মেতে গেলাম। লেক এক্স-এর জলের স্যাম্প্‌লগুলো সিল্‌ড কনটেনারে করে নিয়ে যেতে হবে হেডকোয়ার্টারে। যাবতীয় অ্যানালিসিস সেখানেই হবে—এইরকমই নির্দেশ আছে আমাদের ওপরে।

গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে যখন আমরা কাজ করছি তখনও বুঝতে পারিনি পরদিনই আমাদের বেহালার সুর বাজাতে হবে।

চার

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু গা এলিয়ে দিলাম। যে-কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছিলাম সেটা মোটামুটি শেষ হওয়াতে বেশ নিশ্চিন্ত লাগছিল। এখন বেশ হালকা মনে বুদ্ধিটাকে খেলানো যায়। তাই স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েকের উধাও হওয়ার কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম স্টোর রুমের সেই 'দুর্ঘটনা'র কথা।

এইসব ব্যাপার নিয়ে রিপোর্টে ঠিক কী লিখব সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সকালে ড্রিল-হাউসে গোছগাছের কাজে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। তাই লাঞ্চের জন্যে আমরা ক্যাম্পে চলে এসেছি। খাওয়াদাওয়ার পর আমি বিশ্রাম নিলেও বাকিরা বিশ্রাম নেয়নি।

চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত আবার ড্রিল-হাউসে গেছে বাকি কাজ গুছিয়ে শেষ করার জন্যে। আমি যখন বলেছি, 'এত টায়ার্ড হয়ে পড়েছ...একটু রেস্ট নিলে পারতে। তাতে কিছু এনার্জি তৈরি হত।' তার উত্তরে রোহিত মুচকি হেসে বলেছে, 'দাদা, এনার্জি আমাদের সঙ্গেই আছে।' বলে ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে চ্যাপটা বোতলটা বের করে আমাকে দেখিয়েছে। তারপর ওরা দুজনে হাসাহাসি করতে-করতে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেছে।

ড্রিল-হাউসে যে-কাজ বাকি আছে তাতে এ-বেলায় শেষ হবে না। কাল সকালটাও লেগে যাবে। দেখা যাক, কত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটানো যায়!

চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত বেরিয়ে যাওয়ার পর সুজাতা রান্নাঘর গুছিয়ে ফেলার কাজে লেগে পড়েছিল। আর অদিতি ল্যাবে ব্যস্ত ছিল—বোধহয় ব্লাড টেস্ট করছিল।

আমি একা-একা আনমনা চিন্তায় ডুবে গেলাম।

এলোমেলো ভাবতে-ভাবতে মনে পড়ে গেল বাড়ির কথা। কৃষ্ণার কথা, টুসকির কথা।

আন্টার্কটিকার সঙ্গে কলকাতার সময়ের তফাত মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মতো। এখন তা হলে কী করছে টুসকি? পড়ছে, না খেলছে? শেষ ওদের টেলেক্স করেছি দিনসাতেক আগে। যে-মেসেজটা টেলেক্স করতে হবে সেটা আমরা রেডিয়ো কমিউনিকেশানের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিই বেস স্টেশনে। সেখান থেকে ওরা স্যাটেলাইটের সাহায্য নিয়ে টেলেক্স মেসেজ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

কৃষ্ণা আর টুসকির কথা ভাবতে-ভাবতে হোমসিক হয়ে পড়লাম। সবকিছু ভুলে গিয়ে মনে হতে লাগল কতক্ষণে বাড়ি ফিরে গিয়ে টুসকিকে জাপটে ধরে চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দেব। আমার ছোট্ট মেয়েটা আইসক্রিম-পাগল। যখন আন্টার্কটিকার জন্যে বাড়ি ছেড়ে রওনা হই তখন ও বারবার বলছিল, 'বাবার কী মজা! ওখানকার বরফের ওপরে "রোজ" সিরাপ ঢেলে দিয়ে দিব্যি মজা করে খেতে পারবে।' শত চেষ্টাতেও ওকে বোঝাতে পারিনি যে, আন্টার্কটিকায় এসে কারও আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করবে না।

টুসকির কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে-মনে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম :

ধবধবে সাদা বরফের ওপরে কে যেন লাল রঙের 'রোজ' সিরাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি সেই সিরাপে জিভ ছোঁয়াতেই মিষ্টির বদলে নোনতা স্বাদ পেলাম। সিরাপটা কখন যেন বদলে গেছে রক্তে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘরকাতরতা উবে গেল। ভেসে গেল কৃষ্ণা আর টুসকির চিন্তা। রূঢ় বাস্তব ধাক্কা মারল আমাকে।

তন্দ্রার মধ্যেই আবছাভাবে মনে হচ্ছিল কে যেন আমাকে ডাকছে। এখন বুঝলাম, অদিতি। ও আমার কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—হাতে কয়েকটা কাচের স্লাইড আর একটা স্যাম্প্‌ল ব্যাগ।

'সূর্যদা, আমার টেস্ট করা হয়ে গেছে। স্যাম্প্‌লটা মানুষের রক্ত। হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ আর হোয়াইট ব্লাড কর্‌পাসল্‌স-এর শেপ দেখে বোঝা গেছে।'

কথাটা বলতে গিয়ে অদিতির গলা কেঁপে গেল। ও জ্যাকেটের হাতা দিয়ে চোখ মুছল। বোধহয় পবনের খুনের ব্যাপারটা ওকে আবার ধাক্কা দিল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। ওর হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে গুছিয়ে রেখে দিলাম। মনের মধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করছিল। বুঝলাম, সন্দেহ বড় বিষম বস্তু।

আমি অদিতির মুখের দিকে তাকালাম। নাঃ, ওকে আর বাড়তি ঝুঁকির মধ্যে ফেলাটা ঠিক হবে না।

ওকে বললাম, 'আমি ড্রিল-হাউসে যাচ্ছি...সুজাতার কাজ হয়ে গেলে ওকে নিয়ে ড্রিল-হাউসে এসো। হাতের সব কাজ সেরে নিই। তারপর কাল হালকা মেজাজে পেঙ্গুইন রুকারিতে বেড়াতে যাব। আর কাল রাতে রেডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে ফাইনাল প্যাকিং শুরু করব। ও. কে.?'

'ও. কে., সূর্যদা।' বলে অদিতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আমার দলের এই মেয়েটা এককথায় সম্পদ। সবসময়েই ও যে-কোনও কাজের জন্যে তৈরি। এরকম বিপজ্জনক অভিযানে এরকম বেপরোয়া মেয়ে খুব জরুরি।

অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে শুরু থেকে ঘটনাগুলো ভাবছিলাম।

প্রথমে পবন শর্মা খুন হল। উধাও হল ওর মৃতদেহ।

এরপর উধাও হল সুরেন্দ্র নায়েক।

ব্যাপারটা অনেকটা পবন শর্মার মতোই—শুধু রক্তের দাগটুকু যা পাওয়া যায়নি।

পবন আর সুরেন্দ্র—ওরা দুজনেই উধাও হয়েছে ড্রিল-হাউস থেকে।

পবনের ধারণা ছিল, ড্রিলিং শ্যাফ্‌ট বেয়ে কোনও প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ লেক এক্স থেকে উঠে আসতে পরে। অথচ সুরেন্দ্র কিন্তু মোটেই ভিতু ছিল না।

দুরকমের দুজন মানুষ ড্রিল-হাউস থেকে উধাও হয়ে গেল।

এখন তো আমরা লেক এক্স-এর জলে পৌঁছে গেছি! কোনও সরীসৃপের সন্ধান তো আমরা পাইনি! আসলে পবন আর সুরেন্দ্রকে সরীসৃপের মতো কোনও মানুষ খুন করেছে। আমাদেরই কেউ একজন।

তারপর আজ সকালের ঘটনা—কিংবা বলা ভালো দুর্ঘটনা।

স্টোর রুমের ওই অ্যাক্সিডেন্টটার জন্যে আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না। কিন্তু আমাকে খতম করাই কি খুনির উদ্দেশ্য ছিল? কারণ, আমার বদলে অন্য কেউ সেখানে যেতেই পারত। তবে যেত না শুধু খুনি—সে ফাঁদ পেতেছে আমাদের জন্যে। আমাদের সবাইকে খতম করে সে কি একা বেঁচে থাকতে চায়?

আনমনা ভাবতে-ভাবতে হাত চলে গিয়েছিল মাথায়। চোট পাওয়া জায়গাটায় এখনও বেশ ব্যথা আছে।

ঠিক তখনই কে যেন আমার ঘরে ঢুকল।

আমাদের ঘরে দরজা একটা আছে বটে, তবে সেটা এতই পলকা যে, থাকা-না-থাকা প্রায় সমান। সেইজন্যেই আমি বরাবর দরজা ভেজিয়ে ঘুমোই—সেটা দলের সবাই জানে। এতদিন দলের অন্য অনেকেই আমার মতো দরজা ভেজিয়ে ঘুমোত, কিন্তু পবন আর সুরেন্দ্রর ব্যাপারটার পর থেকে অদিতি আর সুজাতা দরজায় ছিটকিনি এঁটে শোয়।

কেবিনের জানলা পরদায় ঢাকা ছিল বলে ভেতরটা বেশ অন্ধকার। ফলে কাউকে দেখতে না পেলেও দরজায় সূক্ষ্ম আওয়াজে আমার ছ'নম্বর ইন্দ্রিয় বলে উঠল, কেবিনে কেউ ঢুকে পড়েছে।

খুনি কি এতবড় ঝুঁকি নেবে?

ক্যাম্পের ভেতরেই সে কি খুন করতে চায় আমাকে?

কিন্তু খুনি তো জানে না, হাতের নাগালের মধ্যে একটা আইস অ্যাক্স রেখে আমি ঘুমোই। স্লিপিং ব্যাগের জিপার খানিকটা খুলে ডানহাতটা বের করলাম। অতি সন্তর্পণে আমার হাত সরীসৃপের মতো হেঁটে এগিয়ে গেল আইস অ্যাক্সটার দিকে।

ওটার হাতলটা চেপে ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধকারের মানুষটা চাপা ফিসফিসে গলায় ডেকে উঠল, 'সূর্যদা—।'

কে? গলাটা কার? সে কি জিপার খোলার সামান্য খসখস শব্দটা শুনতে পেয়েছে?

আমি কোনও জবাব দিলাম না। শুধু আইস অ্যাক্সের হাতলের ওপরে আমার মুঠো আরও শক্ত করলাম।

চন্দ্রেশ্বর, রোহিত, অদিতি, কিংবা সুজাতা—যে-ই হোক, তাকে আমি চমকে দেব।

'সূর্যদা...।' আবার চাপা ডাকটা ভেসে এল।

সে কি জানতে চাইছে, আমি জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি? যদি ঘুমিয়ে থাকি, তা হলে কাজ শেষ করতে কোনও অসুবিধে হবে না। আর যদি জেগে থাকি, তা হলে...

'সূর্যদা, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?'

এবার বোঝা গেল, মেয়ের গলা। হয় সুজাতা, নয়তো অদিতি।

আমি সাড়া দিলাম : 'কে?'

'ও, আপনি জেগে আছেন? আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না...ভীষণ ভয় করছে।'

সুজাতাকে এবার চেনা গেল। এই সময়ে ও আমার কেবিনে এসেছে কেন? নেহাত ভয় পাচ্ছে বলে?

আইস অ্যাক্সের ওপরে আমার হাত শিথিল হল। স্লিপিং ব্যাগের জিপারটা আরও খানিকটা খুলে শরীরটাকে সহজ করে নিলাম। তারপর উঠে বসলাম।

সুজাতা আমার খুব কাছে চলে এল। চাপা গলায় ইনিয়েবিনিয়ে বলল, 'আমার ভীষণ ভয় করছে, সূর্যদা। এভাবে আমি আর পারছি না।'



আমি সুজাতার উষ্ণতা টের পেলাম। আলতো করে বললাম, 'ভয় পাওয়ার কী আছে! আর তো দু-একটা দিন!'

'সেইজন্যেই তো আমি আর পারছি না।' অন্ধকারে সুজাতার হাত আমার শরীর খুঁজে পেল ঃ 'আর ক'দিন পরেই তো আমাদের ফিরে যেতে হবে। আবার সেই একঘেয়ে জীবন।'

সুজাতার গল্পটা আমি জানি—ওর মুখেই শুনেছি। পড়াশোনা শেষ করার বছর দুয়েকের মধ্যে ও একটি ছেলের প্রেমে পড়ে। ম্যানেজমেন্টের ঝকঝকে ছাত্র। চোখের সামনে বিরাট স্বপ্ন। ওদের সাধ ছিল, আমেরিকায় গিয়ে সেট্‌ল করবে। ছেলেটি আমেরিকা রওনা হওয়ার দিনসাতক আগে সুজাতার মা হার্ট অ্যাটাকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে ওকে সি-অফ করতে সুজাতা এয়ারপোর্টেও যেতে পারেনি।

তারপর কী যে হল! বিদেশে ও চলে যাওয়ার পর দুটো চিঠি পেয়েছিল সুজাতা। উত্তরও দিয়েছিল। সেই উত্তরের আর কোনও উত্তর আসেনি। ব্যাপারটা এমন আচমকা শেষ হয়ে গেল যেন কোনও গল্পের বইয়ের শেষ পৃষ্ঠাগুলো কেউ একটানে ছিঁড়ে নিয়েছে।

এইভাবেই শেষ হয়েছে সুজাতার অসম্পূর্ণ গল্পটা।

'একঘেয়ে জীবন কেন বলছ? আন্টার্কটিকাতেই বরং আমার একঘেয়ে লাগছে। আমি তো মাঝে-মাঝেই হোমসিক হয়ে পড়ছি।'

আমার কথায় সুজাতা বোধহয় হাসল। সেই ধরনেরই একটা চাপা শব্দ পেলাম যেন। তারপর তেতো গলায় বলল, 'হুঁঃ, হোম থাকলে তবে না হোমসিক! আমার এখানেই ভালো লাগছে, সূর্যদা।'

'হতাশ হওয়া ভালো নয়, সুজাতা। হতাশা একটা অসুখ।' আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করে ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম ঃ 'তুমি যাও—ঘরে গিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করো...।'

ও আমার হাতটা চেপে ধরল। তারপর চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনার মন বলে কিছু নেই?'

'আছে। তবে সেই মনটা পড়ে আছে কলকাতায়। আর এখানে? এখানে আমি বরফের দেশের প্রাণী ছাড়া আর কিছু নই।'

'আপনি এত অন্যরকম কেন বলতে পারেন?'

'তুমিই বলো—তুমি তো মেরিন বায়োলজিস্ট...।'

এবার আমাকে আঁকড়ে ধরল সুজাতা। আমার কাঁধের কাছে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলল, 'আমি যে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, সূর্যদা।'

আমি ওকে বাধা দিলাম না। কৃষ্ণা আর টুসকির বর্ম আমাকে আন্টার্কটিকার বরফ করে দিয়েছে।

ওকে শুধু বললাম, 'তুমি খুব লাকি, সুজাতা, যে তুমি কষ্ট পেতে জানো। অনেক মানুষ আছে যারা কষ্টও টের পায় না। ভাবো তো, তাদের কী কষ্ট!'

'যেমন আপনি...।' কথা বলতে-বলতে আমার হাতের আঙুলে পাগলের মতো মোচড় দিতে লাগল ও।

আমি অন্ধকারে হেসে ফেললাম। বুক ঠেলে একটা বড় শ্বাস বেরিয়ে এল। সুজাতা আমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝবে না। ভালোবাসার দুর্গে ফাটল ধরাতে গেলে তার চেয়েও তীব্র ভালোবাসা দরকার হয়। কৃষ্ণা আর টুসকিকে হারানো কি এতই সহজ! সুজাতা এটা বোঝে না?

মেয়েটার জন্যে কষ্ট হল আমার। বুঝতে পারছিলাম, মনে-মনে ও খুব একা। আর এটাও বুঝতে পারছিলাম, ও আর অদিতি একই ধাতুতে গড়া নয়।

সুজাতা আমার গায়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল ঃ 'সূর্যদা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে...।'

আমি ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, 'সুজাতা, তোমাকে একটা কথা বলি...।'

'কী কথা?' শ্বাস টানতে-টানতে জিগ্যেস করল ও।

'ভগবানের দোকানে পাঁচফোড়নের প্যাকেট বিক্রি হয়—তাতে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, যন্ত্রণা, ভালোবাসা, কষ্ট—সব মেশানো থাকে। কেউ চাইলেই শুধু সুখ, আনন্দ আর ভালোবাসার প্যাকেট কিনতে পারে না। আসলে ওই পাঁচফোড়নের প্যাকেটটাই জীবন। তোমার কি ধারণা আমার কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই? আছে। কারও বাইরেটা দেখে ভেতরটা বোঝা যায় না। তুমি মন খারাপ কোরো না। দেখো, দু-দিন পরেই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। তুমি যাও...ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো...দেখবে ঘুম এসে যাবে।'

সুজাতা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। আমি ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ওর উষ্ণতা টের পাচ্ছিলাম খানিকটা। ওর মাথা থেকে হাত

নামিয়ে নিলাম ধীরে-ধীরে।

সুজাতা মেয়ে খারাপ নয়। অবশ্য আমরা কেউই খারাপ নই। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে একজন ভয়ঙ্কর খুনি লুকিয়ে রয়েছে।

আমি ডাকলাম ঃ 'সুজাতা—।'

'উঁ—।' ও আমাকে আঁকড়ে ধরল।

'তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?'

সুজাতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল পলকে ঃ 'সন্দেহ?'

'হ্যাঁ।' ঠান্ডা গলায় বললাম আমি, 'আমাদের মধ্যে কাকে তোমার খুনি বলে মনে হয়?'

ভালো করে দেখতে না পেলেও অনুমান করতে পারলাম, সুজাতা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলল, 'সূর্যদা, সেরকমভাবে কাউকে সন্দেহ হয় না। তবে নিশ্চয়ই আমরা যারা বাকি রয়েছি...তাদের মধ্যেই কেউ। এই ধরুন, আপনি...আমি...চন্দ্রেশ্বর...আমরা পাঁচজন...।'

'আচ্ছা সুজাতা, এমন কিছু কি তুমি দেখেছ, যাতে তোমার সন্দেহ হয়েছে, খটকা লেগেছে...?'

'না, সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না...।' ইতস্তত করে ও বলল।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'অকওয়ার্ড কোনও ইনসিডেন্ট—ছোট হোক, বড় হোক—কিছু মনে পড়ছে না?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমি কী একটা বলতে যাব, তখনই সুজাতা বলে উঠল, 'আপনি বলছেন বলে মনে হচ্ছে...আজ খুব সকালে আমি টয়লেটে যাব বলে উঠেছিলাম। তখন দেখি রোহিত স্টোর রুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই বলল, খিদে পাচ্ছে বলে খাবার খুঁজতে স্টোরে ঢুকেছিল। কিন্তু ওর হাতে খাবারের কোনও ক্যান-ট্যান কিছু ছিল না।'

'হয়তো পকেটে ছিল...।'

'তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু তারপরই স্টোর রুমে আপনার ওই অ্যাক্সিডেন্ট...ওটা কি আপনি জেনুইন অ্যাক্সিডেন্ট বলে মনে করেন, সূর্যদা?'

কে বলেছে সুজাতার বুদ্ধি নেই!

'তুমি ঠিকই গেস করেছ। ওটা বোধহয় অ্যাক্সিডেন্ট নয়। কেউ ওটা ''সাজিয়েছে''।'

'ওটা রোহিতের ডিজাইন হতে পারে?'

সুজাতা এত নির্লিপ্তভাবে কথাটা বলল যে, আমার অবাক লাগল।

রোহিত আইস এক্সপার্ট। বরফের হালচাল ও সকলের চেয়ে ভালো জানে। তাহলে কি ও-ই সরিয়ে দিয়েছে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েককে—তারপর বরফের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে ওদের ডেডবডি?

কিন্তু দুটো ডেডবডি লুকোনোর জন্যে আইস এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই—আইস অ্যাক্স দিয়ে বরফ খুঁড়ে ফেললেই হল। অবশ্য তাতে সময় লাগবে—তা ছাড়া আন্টার্কটিকার বরফও বেশ শক্ত। সুতরাং, দু-দুটো মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার জন্যে বরফ খুঁড়তে হলে সেটা আমাদের চোখের আড়ালে করাটা রীতিমতো কঠিন।

সেই কঠিন কাজটাই কি রোহিত সেরে ফেলেছে।

কিন্তু তাতেও যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে!

রোহিত কিংবা আর যে-ই খুনি হোক, সে কি খুন করবে বলে আগে থেকেই কোনও গর্ত খুঁড়ে রাখতে পারে?

প্রথম কথা, বরফ মাটি নয় যে, গর্ত খুঁড়ে রাখলে সেটা সহজে বুজে যাবে না। এখানে প্রায়ই ঝড় উঠছে...সে-ঝড়ে গর্ত নিশ্চিতভাবে বুজে যাবে। তা ছাড়া, আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি গর্ত খুঁড়ে রাখলে সেটা আর-সবার চোখে পড়ে যাবে।

নাঃ, অঙ্ক মিলছে না।

আন্টার্কটিকায় ডেডবডি উধাও করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। অথচ সেটাই হয়েছে। ডেডবডি দুটো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

চিন্তাগুলো মনের ভেতরে বয়ে গেল ঝড়ের মতো।

তখনই টের পেলাম, সুজাতার হাত আমার হাত চেপে ধরেছে।

'সূর্যদা, ব্যাপারটা রোহিতের ডিজাইন হতে পারে?' চাপা গলায় আবার জিগ্যেস করল সুজাতা।

আমি আলতো করে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। অঙ্কের উত্তর এখনও মেলেনি, সুজাতা। খবরটা দিয়ে তুমি ভালো করলে।'

সুজাতা আমার হাতটা আঁকড়ে ধরল আবার। বলল, 'আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব, সূর্যদা?'

আমি এতটুকু বিচলিত হলাম না। যে-কোনও রিকোয়েস্টের স্পষ্ট উত্তর দিতে আমি ভালোবাসি। তাই বললাম, 'বলো, কী রিকোয়েস্ট?'

সুজাতা এরপর যা করল তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

অন্ধকারে ও একটা আংটি গুঁজে দিল আমার হাতে। বলল, 'সূর্যদা, এই আংটিটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমাকে একজন দিয়েছিল—আমেরিকা যাওয়ার আগে। সেই ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেলেও আংটিটা ও যখন দিয়েছিল তখন আমাদের ভালোবাসা নষ্ট হয়নি। তখন রোজ ভোর হত ভালোবাসা দিয়ে, রাত নামত ভালোবাসা নিয়ে। কী দারুণ সময় ছিল!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুজাতা ঃ 'এই আংটিটা আপনি রাখুন, সূর্যদা। এটা আপনি নিলে আমার ভীষণ ভালো লাগবে।'

সুজাতা হঠাৎই কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'আপনাকে যখনই দেখি...কেন জানি না, ওর কথা মনে পড়ে যায়। আপনি এটা রাখুন, সূর্যদা, প্লিজ...।'

কাঁদতে-কাঁদতেই আমাকে একরকম জাপটে ধরল সুজাতা। আংটি ধরা হাতের তালুটা জোর করে মুঠো করে দিল। তারপর কাঁদতেই থাকল।

শুনতে পেলাম, কান্নার গোঙানির মধ্যেই ও বারবার বলছে, 'আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছে না...আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছে না...।'

আমি চুপচাপ সুজাতাকে অনুভব করতে লাগলাম। ওর পিঠে হাত রাখলাম।

জীবন এইরকমই ঃ কখনও নিষ্ঠুর, কখনও সুন্দর।

অনেকক্ষণ পর শান্ত হল সুজাতা। ওর আঙুল আমার আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আমি একসময় বললাম, 'সুজাতা, এবারে যাও—তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল অনেক কাজ আছে।'

উত্তরে ও বলল, 'না সূর্যদা—আমি এখানে শোব...।'

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই সুজাতা আমার কাছ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ছোট্ট খুকির বায়না করার মতো বলল, 'আমি আপনার কাছে ঘুমোবো—।'

'তোমার যা খুশি...।'

বহু পরীক্ষা আমি পার হয়ে এসেছি...সুজাতা নতুন করে আর কী পরীক্ষা নেবে!

তবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি যা ভাবছিলাম সেটা জানতে পারলে সুজাতা খুব কষ্ট পেত।

আমি ভাবছিলাম, আমাকে চুপিসাড়ে খুন করতে এসে আমি জেগে আছি দেখে সুজাতা এরকম ন্যাকা-ন্যাকা অভিনয় করছে না তো!

পাঁচ

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর শুধু কাজ আর কাজ।

সম্ভবত আজই আন্টার্কটিকায় আমাদের শেষ কাজের দিন। হয়তো রাত থেকেই শুরু করে দেব তল্পিতল্পা বাঁধার কাজ।

তাই চটপট সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিলাম।

চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত ড্রিল-হাউসে ডিউটি করতে গেল। সুজাতা আর অদিতি পড়ল মেরিন বায়োলজি আর মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে।

আমি ক্যাম্পে বসে কাল রাতের কথা ভাবতে লাগলাম।

কাল রাতে সুজাতা যদি সত্যি-সত্যি অভিনয় করে থাকে তা হলে মানতেই হবে ও খুব বড় অভিনেত্রী। ওর নাম সুজাতার বদলে সুচিত্রা হতে পারত।

আমি ভাবছিলাম আর একটা অসম্ভব ধাঁধার সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

খুনি ভুল করবেই। আমাদের খুনিও করেছে। কিন্তু কী সেই ভুল?

ভাবতে-ভাবতে থইথই জলে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পর মনে হল, এবার বাইরে বেরোই। চারিদিকে ঠিকঠাক নজর রাখি, যাতে নাটকের শেষ দৃশ্যে আর কোনও ছন্দপতন না হয়।

তাই বাইরের পোশাক গায়ে চাপিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে বেরোলাম।

চারিদিকে শুধু বরফ অর বরফ। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। যেন এই চাদরের নিচে কোনও পবিত্র মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। তবে মৃতদেহ তো একটি নয়—অনেক। তার মধ্যে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েকও রয়েছে।

সামান্য হাওয়া বইছিল। হয়তো নতুন কোনও তুষারঝড়ের খবর পাঠাচ্ছিল। আমি ড্রিল-হাউসের দিকে কয়েক পা এগোতেই চোখ পড়ল টয়লেটের দিকে। তিনটে পেঙ্গুইন টয়লেটের কাছে ঘোরাফেরা করছে।

আমার একটু অবাক লাগল। ওখানে তো খাবার-দাবার কিছু নেই যে, পাখিগুলো এভাবে ঘোরাফেরা করবে!

পেঙ্গুইনকে দেখে কখনওই আমার পাখি বলতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন বলছেন তখন আর উপায় কী! আদিম যুগে সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের ফলে এসেছিল পাখি। পেঙ্গুইন সেই আদিম পাখিদের একটি। আন্টার্কটিকা অঞ্চলে হিসেব মতো ছ'রকমের পেঙ্গুইন পাওয়া যায়—তার মধ্যে এম্পারার পেঙ্গুইন আর অ্যাডেলি পেঙ্গুইন হল মূল মহাদেশের বাসিন্দা। বাকিরা সব কুমেরু বৃত্তের বাইরে আন্টার্কটিকার আশপাশের দ্বীপগুলোতে থাকে। আন্টার্কটিকা মহাদেশের দুরকম পেঙ্গুইনের মধ্যে আবার অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি।

পেঙ্গুইনরা জলে পাকা সাঁতারু। এদের পায়ের পাতা হাঁসের মতো। সাঁতারের গতি ঘণ্টায় প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। এরা জলের তলায় একশো ফুট গভীর পর্যন্ত চলে যেতে পারে, আর জলে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ডুবসাঁতার দিতে পারে। ডানা দিয়ে এরা সাঁতার কাটে, আর সাঁতারের দিক পালটায় পায়ের পাতা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে যখন এরা জল থেকে লাফিয়ে ডাঙায় ওঠে। রকেটের মতো জল ভেদ করে বেরিয়ে সটান বরফের উঁচু ডাঙায় দাঁড়িয়ে পড়ে—ঠিক যেন কলের খেলনা। সমুদ্রের চিংড়ি এদের প্রধান খাদ্য বলে এরা আন্টার্কটিকার উপকূল ঘেঁষে আস্তানা গাড়ে। কৃত্রিম এই রুকারিটা আন্টার্কটিকার একমাত্র ব্যতিক্রম।

কৌতূহল আমাকে টয়লেটের দিকে টেনে নিয়ে গেল। আগামীকাল যদি আমাদের এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে হয়, তা হলে পবন বা সুরেন্দ্রর মৃতদেহ খোঁজার সুযোগ বলতে শুধু আজই। তাই পায়ে-পায়ে পৌঁছে গেলাম টয়লেটের কাছে।

পরশু রাতের তুষারঝড়ে টয়লেটের চেহারা পালটে গেছে। বরফের পাঁচিলগুলো বেঢপ আকারের হয়ে গেছে। ভেতরে বরফ ঢুকে কেমন ঢিবির মতন হয়ে গেছে। ঠিক কোনদিকটায় যেন রক্তের দাগগুলো

দেখেছিলাম? নাঃ, এখন সেখানে আর কোনও চিহ্নই নেই। সব বরফে চাপা পড়ে গেছে।

এমন সময় শুনলাম কে যেন আমাকে চেঁচিয়ে ডাকছে।

তাড়াতাড়ি টয়লেটের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ড্রিল-হাউসের কাছ থেকে দুজন আকাশে হাত তুলে নাড়ছে আর আমাকে ডাকছে, 'সূর্যদা, জলদি আসুন, কুইক!'

ওদের হাইট দেখে মনে হল, সুজাতা আর অদিতি। কিন্তু ওরা এরকম উদভ্রান্তের মতো আমাকে ডাকছে কেন?

তাড়াতাড়ি ওদের কাছে গেলাম।

'চন্দ্রেশ্বর আর রোহিতকে পাওয়া যাচ্ছে না!' অদিতি হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল।

'ড্রিল-হাউসে ঢুকে দেখি ওরা কেউ নেই!' সুজাতা প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল।

আবার ড্রিল-হাউস! আবার দুজন উধাও! এ কী অলৌকিক কাণ্ড ঘটছে বারবার! কোথায় গেল চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত? ওরা তো ছেলেমানুষ নয় যে, হঠাৎ করে হারিয়ে যাবে!

আর হারিয়ে যাবেটাই-বা কোথায়?

বরফের ওপরে যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় পা ফেলতে চেষ্টা করলাম। উধাও হওয়ার এই সিঁড়িভাঙা অঙ্ক যেভাবে হোক আমাকে সমাধান করতেই হবে।

অদিতি আর আবেগজর্জর সুজাতাকে সঙ্গে করে ড্রিল-হাউসে ঢুকলাম। ড্রিল-হাউসটাকে এই মুহূর্তে কোনও অপদেবতার অভিশপ্ত কফিন বলে মনে হচ্ছিল।

না, সুজাতা আর অদিতি ভুল বলেনি। ড্রিল-হাউসে কেউ নেই!

চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত যদি আমাদের না জানিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়ে থাকে, তা হলে মানতেই হবে সে বড় নিষ্ঠুর রসিকতা।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওরা এমন জায়গায় লুকিয়ে পড়েছে যেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না। অদিতি আর সুজাতারও নিশ্চয়ই সেরকমই মনে হচ্ছিল।

আমরা সবাই চোখ-ঢাকা গগল্স তুলে দিয়েছিলাম মাথার ওপরে।

লক্ষ করলাম, অদিতির চোয়াল শক্ত, আর সুজাতা থরথর করে কাঁপছে। ওদের মুখে খসখসে রুক্ষ ভাঁজ।

এ যেন সেই হারাধনের ছেলেদের কাহিনি। হারিয়ে গিয়েছিল দুজন—এখন দুই দুগুণে চারজন!

'এসো, চটপট রুমটা সার্চ করে ফেলি।' নির্দেশ দিতে গিয়ে আমার গলাটা কেমন কেঁপে গেল।

আমার কথায় অদিতি আর সুজাতা সংবিৎ ফিরে পেল যেন। তারপর যন্ত্রের মতো কাজ শুরু করল।

আমি ওদের দেখছিলাম। গত তিন-চার দিনে কত বদলে গেছে ওরা!

অথচ এখানে আসার সময় থেকেই ওরা দুজন উৎসাহ উদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটত। সবসময় আন্টার্কটিকা নিয়ে নানান প্রশ্ন করে আমাকে আর রোহিতকে নাজেহাল করে দিত।

রোহিত একদিন কপট বিরক্তি নিয়ে আমাকে বলল, 'দাদা, এই দুজনকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। ওরা আমাকে এত কোশ্চেন করে যে, আপনি তো জানেন, আমি ওদের নাম দিয়েছি "কোশ্চেন জোড়ি"। এখন আমাকে জিগ্যেস করছে, আন্টার্কটিকায় লেডি রিসার্চার হিসেবে ওদের পজিশন কোথায়।'

আমি তখন হেসে বললাম, 'ওদের পজিশন অনেক পেছনে।'

'কেন, অনেক পেছনে কেন!' সুজাতা উদ্ধত ছাত্রীর মতো প্রশ্ন করেছিল আমাকে।

আমি নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'ইতিহাসকে কি আর বদলানো যায়! শোনো...১৯৪৭-এ এক মার্কিন অভিযাত্রী দল এখানে এসেছিল। সেই দলে দুজন মহিলা ছিল ঃ এডিথ রন আর জেনি ডারলিংটন। আন্টার্কটিকায় মহিলা হিসেবে ওরাই প্রথম। তারপর, প্রায় ষাট বছর ধরে, বহু মহিলা এই বরফের মহাদেশে পা রেখেছে। ১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারি আর্জেন্টিনার এক মহিলা অভিযাত্রী একটি শিশুর জন্ম দেন এই মহাদেশে। শিশুটির নাম রাখা হয় এমিলিও মার্কোস পাল্‌মা। আর শুধু ভারতের মহিলা অভিযাত্রীদের হিসেবে ধরলে অদিতি আর সুজাতার পজিশন...আচ্ছা, রোহিত, ওদের মধ্যে কে আগে জাহাজ থেকে নেমে আন্টার্কটিকার বরফে

পা দিয়েছিল বলো তো?'

রোহিত চোখ সরু করে চিন্তার ভান করতে শুরু করল।

সুজাতা তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'আমি আগে নেমেছি। অদিতিদি পরে নেমেছে...।'

অদিতি হাত নেড়ে ওকে বাধা দিয়ে বলল, 'মোটেই না, আমি আগে নেমেছিলাম। তুই তো ছোট...তাই তোর মনে নেই...আগে-পরে গুলিয়ে ফেলেছিস...।'

আমি তখন মধ্যস্থতা করতে চেয়ে বলেছি, 'থামো! থামো! ঝগড়া করে লাভ নেই। তোমরা দুজনে যুগ্মবিজয়ী হয়েছ। তোমাদের পজিশন টুয়েলফ্‌থ—শুধু ইন্ডিয়ান লেডি রিসার্চার ধরলে...।'

সবই মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের ঘটনা!

অথচ আজ, এখন? উচ্ছ্বল টগবগে মেয়ে দুটো কী ভয়ঙ্কর মলিন হয়ে গেছে! যে-কোনও মুহূর্তে সাপ দেখতে পারে এই আতঙ্ক নিয়ে ওরা ড্রিল-হাউস সার্চ করছে।

এসব কথা ভাবছিলাম আর ড্রিল-হাউসের মেঝেটা খুব খুঁটিয়ে নজর করছিলাম। বুটের ডগা দিয়ে মেঝের বরফ খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দেখছিলাম কোনও কিছু পাওয়া যায় কি না। আসলে এইভাবে দু-দুটো জোয়ান মানুষের হুট করে উধাও হওয়ার ব্যাপারটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

হঠাৎই 'ঠক' করে একটা হালকা শব্দ হল।

কী এটা! বরফের ওপরে ঝুঁকে পড়লাম আমি। কী যেন একটা চকচক করছে!

তাড়াতাড়ি পা দিয়ে বরফ খুঁড়তে লাগলাম। তারপর ঝুঁকে পড়ে কোমরে বাঁধা আইস অ্যাক্স খুলে নিলাম।

দশ সেকেন্ডের মধ্যেই আইস অ্যাক্সের কাজ শেষ। বরফ খুঁড়ে জিনিসটা বের করলাম বাইরে।

রোহিতের সেই এনার্জির বোতল।

বোতলটা তুলে নিয়ে ঝাঁকাতেই বুঝলাম, তার ভেতরে এনার্জি এখনও রয়েছে।

বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল আমার। এই বোতল ছেড়ে

রোহিত তো কোথাও যাওয়ার ছেলে নয়!

খারাপ কিছু যে একটা ঘটে গেছে তা নিয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না।

চোখ তুলে দেখি অদিতি তখন ড্রিলের ফ্রেমের গায়ে লাগানো মই বেয়ে ওপরে উঠছে। আর সুজাতা ড্রিল আর দেওয়ালের মাঝখানটায় ঝুঁকে পড়ে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

চট করে বোতলটা তুলে নিয়ে আমি জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। বোতলটা আমি সবার চোখের আড়ালে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

অদিতি বোধহয় মইয়ের ওপর থেকে আমাকে লক্ষ করে থাকবে। ও চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কিছু পেলেন, সূর্যদা?'

আইস অ্যাক্স কোমরে গুঁজে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম, 'না, সেরকম কিছু না।'

কিন্তু অদিতির মুখ দেখে মনে হল একটা সন্দেহের ছায়া সেখানে খেলা করছে।

ওপরে তন্নতন্ন তল্লাশি চালিয়ে অদিতি নেমে এল। সুজাতাও এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

আমি ভাবতে লাগলাম, দুজনের মধ্যে কে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই হাসি পেয়ে গেল আমার। ঠিক একই কথা নিশ্চয়ই সুজাতা আর অদিতিও ভাবছে।

বাইরে হাওয়ার তেজ বাড়ছিল। শোঁ-শোঁ শব্দ কানে আসছে এবার।

'এখন কী করবেন?' অদিতি জিগ্যেস করল।

'ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে একটু ভাবি। তারপর বেস স্টেশনে খবর দেব। সম্ভব হলে দু-চার ঘণ্টার মধ্যেই ওরা প্লেন পাঠিয়ে দিক। খুনির সঙ্গে আর আমি পাশা খেলতে চাই না। আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে।'

আমি ড্রিল-হাউসের দরজার দিকে পা বাড়ালাম। সঙ্গে-সঙ্গে সুজাতা ছুটে চলে এল আমার কাছে। আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে থাকব।'

আমি আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'থাকো না, কে বারণ করেছে!'

আমাদের পেছন-পেছন অদিতিও চলে এল ড্রিল-হাউসের বাইরে।



নেহাত অভ্যেসবশেই আমরা এপাশ-ওপাশ তাকালাম। না, কেউ কোথাও নেই। তারপর এগোলাম ক্যাম্পের দিকে।

ক্যাম্পে ঢোকার সময় ওদের বললাম, আমি একা কিছুক্ষণ ল্যাবে কাজ করতে চাই। ওরা বরং ততক্ষণ নিজেদের কোনও কাজ থাকলে সেরে নিক।

অদিতি জ্যাকেটের বরফ ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, 'আমি তা হলে একটু আমার টেন্টে যাই। কয়েকটা টেস্ট আর রিডিং নেওয়া বাকি আছে।'

সুজাতা প্রায় আঁতকে উঠল ঃ 'আমি তা হলে কোথায় যাব? আমি একা-একা থাকতে পারব না। আমি আপনার সঙ্গে থাকব, সূর্যদা।'

'তুই আমার সঙ্গে চল—' অদিতি প্রস্তাব দিল ঃ 'তা হলে আমাকে একটু হেল্প করতে পারবি।'

আমি বললাম, 'তুমি অদিতির সঙ্গেই যাও, সুজাতা। একা-একা ওর কাজের অসুবিধে হবে।'

আসলে এখন আমার একটু একা থাকা দরকার।

সুজাতা ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল। একপলক কী ভেবে নিয়ে অদিতিকে বলল, 'তাই চলো।'

ওরা দুজন রওনা হয়ে গেল অদিতির তাঁবুর দিকে।

আমি রোহিতের বোতলটা পকেট থেকে বের করলাম। ছিপি খুলে বোতলটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলাম।

নাঃ, অস্বাভাবিক কোনও গন্ধ নাকে আসছে না।

তখন বোতল থেকে কয়েক ফোঁটা তরল ঢেলে নিলাম ছিপিতে—এবং তার রং দেখেই অবাক হয়ে গেলাম। রোহিতের বোতলের তরলটা উজ্জ্বল কমলা রঙের। আমাদের ড্রিল বিটটাকে লুব্রিকেট করার জন্যে একটা ক্যাডমিয়াম কম্পাউন্ড আমরা ব্যবহার করেছি। মনে হচ্ছে, সেই কম্পাউন্ডটা কেউ রোহিতের ব্র্যান্ডির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

ওই ক্যাডমিয়াম কম্পাউন্ডটা মারাত্মক বিষাক্ত কেমিক্যাল। সেটা রোহিতের বোতলে কে মেশাল?

মনে হয়, এই বোতল থেকে রোহিত আর চন্দ্রেশ্বর কয়েক ঢোঁক করে খেয়েছে। আর খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বুঝেছে, না খেলেই ভালো হত। তারপর ওদের সব এনার্জি খতম হয়ে গেছে। অথবা, বিষ খেয়ে

কাবু হয়ে পড়ার পর খুনি এসে বাকি কাজটুকু শেষ করেছে।

সুতরাং, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে রোহিতের বোতল থেকে একটু স্যাম্প্ল নিয়ে টেস্ট করতে শুরু করলাম। যদি ক্যাডমিয়ামের ট্রেস পাই, তা হলে বুঝব আমার সন্দেহ সত্যি।

কুমেরু অভিযানে এসে আমাদের নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিজের বিষয় ছাড়াও অন্য বিষয়ে কাজ করতে হয়েছে। অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে গিয়ে অনেক জিনিস শিখে ফেলেছি আমি। সুরেন্দ্র বেঁচে থাকলে এই অ্যানলিসিসটা ও-ই করত। তারপর বহু খুঁটিনাটি তথ্য আমাকে দিত। কিন্তু সেরকম জ্ঞান বা দক্ষতা আমার নেই। তাই শুধু ক্যাডমিয়ামের ট্রেস খুঁজব। যদি পাই...।

পেলাম।

পেয়েই নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছিল। আমার দলের সাথীরা একজন-একজন করে উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর আমি গ্রুপ লিডার হয়ে নির্বিকারভাবে সব দেখে যাচ্ছি—কিচ্ছু করতে পারছি না!

মনের কোণে সন্দেহ যে একটা উঁকি দিচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সন্দেহ তো আর প্রমাণ নয়! তা ছাড়া আমার সন্দেহ যদি ভুল হয় তা হলে বিপদ আরও বাড়বে। আবার অদিতি আর সুজাতাও হয়তো ওদের মতো করে কাউকে সন্দেহ করছে। কে জানে, ওরাও হয়তো প্রমাণ খুঁজছে।

ভাবলাম, ওদের ডেকে নিই। তারপর আলোচনা করে বেস স্টেশনে রেডিয়ো মেসেজ পাঠাব।

এই কথা ভেবে পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অদিতির তাঁবু পর্যন্ত হেঁটে যাব, না কি ওদের ওয়াকিটকি দিয়ে ডেকে পাঠাব? অদিতি কি ওয়াকিটকি সঙ্গে নিয়ে ওখানে গেছে?

ঠিক তখনই ইঞ্জিনের শব্দ শুনলাম।

আমাদের ক্যাম্পে বা ড্রিল-হাউসে আলো জ্বালানোর জন্যে ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট চলছিল। সেই আওয়াজে নতুন আওয়াজটা চাপা পড়ে যেতেই পারত। পড়েনি যে, তার কারণ ইঞ্জিন-জেনারেটর সেটের শব্দটা আমাদের কানে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজের মতো হয়ে পুরোপুরি সয়ে গেছে। সেইজন্যেই এই বাড়তি আওয়াজটা আমার কানে ধরা পড়ল।

আমি স্টোরের দিকে হাঁটা দিলাম। কারণ, আওয়াজটা আমার সেদিক

থেকেই এসেছে।

আমি স্টোরের বাইরের দরজার কাছে পৌঁছনোর আগেই একটা স্নোমোবাইল নিয়ে অদিতি বেরিয়ে এল। অদিতি যে, সেটা বুঝলাম ওর জ্যাকেটের রং দেখে। এমনিতে ও সুজাতার চেয়ে অনেক লম্বা, কিন্তু স্নোমোবাইলের ড্রাইভিং সিটে বসে থাকায় ওর উচ্চতা বোঝা যাচ্ছিল না।

আমি অবাক হয়ে ওকে জিগ্যেস করলাম, 'কী ব্যাপার? স্নোমোবাইল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

অদিতি কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে...মানে...ওই পেঙ্গুইন রুকারিতে বেড়াতে যাচ্ছি। সুজাতা যেতে চাইছে...।'

'সুজাতা কোথায়?'

'আ-আমার টেন্টে—। ও বলল স্নোমোবাইল নিয়ে আসতে।'

'সুজাতা এ-কথা বলল!' আমি অবাক হয়ে গেলাম : 'যে ভয়ে একমুহূর্তও একা থাকতে চাইছে না সে তোমাকে স্নোমোবাইল আনার জন্যে ছেড়ে দিল—তোমার সঙ্গে এল না!'

'না, মানে...ও বলল...।' অদিতি একটা উত্তর তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। আর তখনই জিনিসটা আমার নজরে পড়ল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এখন খেয়াল করলাম।

অদিতির জ্যাকেটে রক্তের ছিটে।

'সুজাতাকে তুমি কী করেছ?' বলেই আমি ওর ওপরে বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমি নড়বার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে অদিতি স্নোমোবাইল চালিয়ে দিল। গাড়িটার ধাক্কায় আমি পড়ে গেলাম। কমলা রঙের গাড়িটা ছিটকে গেল বরফের ওপরে। গর্জন করে এগিয়ে চলল অদিতির তাঁবুর দিকে।

আমি কোনওরকমে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলাম অদিতির তাঁবু লক্ষ করে।

খানিকটা এগোনোর পরই দেখি একটা দেহ ধরাধরি করে এনে রাখা হল স্নোমোবাইলে।

কিন্তু অদিতি তো একা নয়! ওর সঙ্গে আর-একজন কে?

যদি ধরে নিই ওরা দুজনে সুজাতার ডেড বডি স্নোমোবাইলে এনে

রাখল, তা হলে অদিতির সঙ্গী কে?

আর যদি এমন হয় যে, অদিতি আর সুজাতা অন্য কারও মৃতদেহ—রোহিত, চন্দ্রেশ্বর, বা আর কারও—স্নোমোবাইলে তুলল, তা হলে সুজাতাকেই অদিতির কুকাজের সঙ্গী বলে মানতে হয়।

কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে অদিতির জ্যাকেটে রক্তের ব্যাখ্যাটা তো পাওয়া যাচ্ছে না!

আমার সব অঙ্ক গুলিয়ে যেতে লাগল।

আমি আর দেরি করলাম না। তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলাম ক্যাম্পের কাছে। স্টোরের বাইরের দরজাটা হাট করে খোলা ছিল। চটপট স্টোরে ঢুকে একটা স্নোমোবাইল স্টার্ট করলাম।

ঠান্ডায় এই গাড়িগুলোর স্টার্ট নিতে কোনও সমস্যা হয় না। জাপানের 'হিয়োমোটো কর্পোরেশন'-এর স্নোমোবাইলের বিশেষত্বই এই—সাবজিরো এনভায়রনমেন্টে উষ্ণ দেশের সাধারণ গাড়ির মতোই আচরণ করে। আর এদের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও কম। তা ছাড়া বরফের ওপর চলার সময় ফ্রিক্‌শনাল ফোর্স খুব কম বলে এই গাড়ির মোটিভ পাওয়ারও তেমন বেশি প্রয়োজন হয় না।

বাইরে এসে স্নোমোবাইল চালিয়ে দিলাম অদিতির তাঁবু লক্ষ করে। দেখি ওদের গাড়িটা তাঁবু ছাড়িয়ে তখন অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে।

আন্টার্কটিকায় গাড়িতে চড়ে কোনও গাড়িকে অনুসরণ করার কাজটা মোটেই কঠিন নয়। কারণ, পলাতক গাড়িটা বরফে তার স্পষ্ট চলার দাগ রেখে যায়। তাই বরফের ঢালের ওঠা-নামায় কখনও-কখনও অদিতির গাড়িটা হারিয়ে গেলেও আমি পথ হারাইনি।

স্নোমোবাইলে ব্রেক নেই। অ্যাকসিলারেটরে চাপের হেরফের করে গতি কম-বেশি করতে হয়, এবং দরকার হলে গাড়ি থামানোও যেতে পারে। আর গাড়ির দুটো গিয়ারকে প্রয়োজনমতো সুইচ টিপে বদলানো যায়। বরফ যদি মোটামুটি মসৃণ হয় তা হলে স্নোমোবাইলের গতি ঘণ্টায় তিরিশ কি পঁয়তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

এখন গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা প্রায় পঁচিশ কিলোমিটারের দাগ ছুঁই-ছুঁই। এবড়োখেবড়ো পথের জন্যে চলার সময়ে সামান্য ঝাঁকুনি দিচ্ছে। কিন্তু সামনের একটা ঢালের কাছে পৌঁছেই গাড়ির গতি কমিয়ে একেবারে

দশে নিয়ে আসতে হল। কারণ, সামনের ঢালে 'সাস্‌ক্রুগি' অনেক বেশি।

আন্টার্কটিকায় যখন ঝোড়ো হাওয়া বয় তখন ভারি বাতাসের দুরন্ত গতির জন্যে বরফের ওপরে গভীর আঁচড় পড়ে যায়। ভিজে বালির ওপরে আঙুল টানলে যেরকম গর্ত হয় অনেকটা সেই ধরনের নকশা কাটা হয়ে যায় বরফের গায়ে। এরকম পাশাপাশি দুটো লম্বাটে গর্তের মাঝে থাকে বরফের আল। এ ধরনের গর্তকেই বলে সাস্‌ক্রুগি। সাস্‌ক্রুগির ওপর দিয়ে স্নোমোবাইল চালানো খুব ঝকমারি। তাই আমাকে গতিবেগ কমাতে হয়েছে। অবশ্য গতিবেগ কমিয়েছে অদিতিও।

অনেকটা সাস্‌ক্রুগি-অঞ্চল পেরোনোর পর বাটির মতো ঢালু একটা জায়গায় চলে এলাম। এতদিনের দিকনির্ণয়ের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছিলাম, অদিতি স্নোমোবাইল নিয়ে পেঙ্গুইন রুকারির দিকেই চলেছে।

কিন্তু কেন? শেষ পর্যন্ত কোথায় যেতে চায় ও?

সেটা বোঝা গেল খানিক পরেই। কারণ, পেঙ্গুইন রুকারির খুব কাছে গিয়ে থামল অদিতির গাড়ি।

অবশ্য গাড়ি না থামিয়ে উপায় ছিল না।

এতক্ষণ মাথার ওপরে গাঢ় নীল আকাশ ছিল, ছিল স্তিমিত হলুদ সূর্য, আর তুলোর স্তূপের মতো কয়েক গণ্ডা ধবধবে মেঘ। এখন সাদা মেঘে সূর্য ঢেকে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ চরাচরে 'হোয়াইট আউট' হয়ে গেছে। আন্টার্কটিকার 'হোয়াইট আউট' হল ব্ল্যাক আউটের ঠিক উলটো। অর্থাৎ, চারপাশ অন্ধকার কিংবা কালোর বদলে সাদাটে হয়ে যায়। এখন মেঘে ঢাকা সূর্যের আলো ঘষা কাচের মতো ঘোলাটে হয়ে গেছে। ফলে কোথাও কোনও ছায়া না পড়ায় সাদা বরফে কোনও উঁচু-নিচু জায়গা কিংবা সাস্‌ক্রুগি মোটেই আর ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় গাড়ি চালানো খুব মুশকিল।

হয়তো সেইজন্যেই স্নোমোবাইল থামিয়েছে অদিতি। তারপর ওরা নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।

অদিতির গাড়ির কাছ থেকে বরফের ঢালটা আরও নিচে নেমে গিয়ে মিশে গেছে কৃত্রিম হ্রদের জলে। সেখানে অসংখ্য অ্যাডেলি পেঙ্গুইন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া, অদিতির গাড়ি থামতেই গোটা পাঁচ-ছয় কৌতূহলী পেঙ্গুইন এসে ওদের প্রায় ঘিরে ধরল।

ওদের কাছে গিয়ে স্নোমোবাইল থামালাম আমি। নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই অদিতি শক্ত গলায় বলে উঠল, 'আইস অ্যাক্সটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিন, সূর্যদা।'

আমি সময় নিতে চাইলাম। ওর সঙ্গের পুরুষমানুষটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইলাম সে কে। কারণ, চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। মাথা টুপিতে ঢাকা, চোখে ঠুলির মতো জম্পেশ গগল্‌স, গায়ে হাড়-কাঁপানো শীতের জ্যাকেট, পায়ে ভারি জুতো। শরীরের খোলা জায়গা বলতে শুধু দু-গালের দুটো ত্রিভুজ, নাক, আর গোঁফের নিচে ঠোঁটের রেখা।

অদিতিকে সাহায্য করতে নতুন কেউ কি এসেছে আমাদের ক্যাম্পে?

অসম্ভব! আমাদের চোখ এড়িয়ে নতুন কোনও লোক ক্যাম্পে আসতেই পারে না!

অদিতি আবার বলল, 'আইস অ্যাক্সটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিন।'

ওর গলাটা চারপাশের বরফের চেয়েও ঠান্ডা শোনাল।

ওদের কথা শুনে অনুমানে বুঝলাম, ওদের কাছে পিস্তলজাতীয় কোনও অস্ত্র নেই। থাকলে নির্ঘাত সেটা আমাকে দেখাত। তা ছাড়া, আন্টার্কটিকাতে লুকিয়ে পিস্তল-টিস্তল আনা মুশকিল। তাই আইস অ্যাক্সটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে ডানহাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলাম। ভাবটা এমন, ছুড়ে দিতেও পারি, আবার না-ও দিতে পারি।

'সূর্যদা, কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছেন!' নকল অনুনয়ের সুরে জঙ্গি মেয়েটা বলল, 'কেন বুঝতে পারছেন না, এটা বইয়ের লাস্ট চ্যাপটার—লাস্ট চ্যাপটারে আপনার আর কিছু করার নেই...মরা ছাড়া...।'

'অদিতি, এখনও বলছি তুমি ভুল করছ।' আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম ঃ 'এখনও থামার সময় আছে।'

খিলখিল করে হাসল অদিতি—অনেকক্ষণ হাসল। তারপর বড়-বড় শ্বাস নিয়ে বলল, 'থামার জন্যে এতগুলো মৃতদেহ ডিঙিয়ে আমরা এতটা পথ আসিনি। লেক এক্স-এর জলের অ্যানালিসিসের যাবতীয় খবর শুধু আমরা দুজন বিজ্ঞানের দুনিয়াকে জানাতে চাই। রিসার্চ পেপার যা-কিছু পাবলিশ করব সব আমাদের দুজনের নামে। আর যদি কপালে নোবেল-

টোবেল জুটে যায় তা হলেও ভাগাভাগি করব আমরা দুজন। জানেন তো, খ্যাতি বেশি ভাগ হয়ে গেলে তার আর গুরুত্ব থাকে না। তাই দু-ভাগের বেশি করতে আমার মন চায়নি। অর্ধেক আমি, আর বাকি অর্ধেক ও। নো থার্ড পারসন। লাইক দ্য আইডিয়া? নাউ গেট রিড অফ দ্য ব্লাডি আইস অ্যাক্স, উইল য়ু?'

ওর সঙ্গের লোকটা কে? ওর সঙ্গের লোকটা কে হতে পারে?

'সূর্যদা, বাচ্চা ছেলের মতো জেদ করবেন না। আমরা দুজন, আপনি একা—য়ু ডোন্ট হ্যাভ আ ড্যাম চান্স। তাই ভদ্রভাবে মরার চেষ্টা করুন—বরফে কবর দেওয়ার আগে আপনার বডিটা নক্কা-ছক্কা হোক সেটা নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন না! সো ট্রাই টু ডাই ডিসেন্টলি।'

'সুজাতাকে তুমি খুন করেছ?'

'হ্যাঁ, করেছি—তা ছাড়া আর উপায় কী!' হাসল অদিতি : এখন ওর বডিটাকে এখানে কবর দেব। আর আপনাকে জ্যান্ত টেনে আনব বলে ক্যাম্পে খতম করিনি। ডেডবডি বয়ে আনার ঝামেলা তো আপনি জানেন! এখন সুবিধে হল, আপনি নিজেই কবরখানায় চলে এসেছেন...নিন, এবার আইস অ্যাক্সটা ছুড়ে ফেলে দিন!'

এইবার ওর সঙ্গী একটা বড় ছুরি বের করে নিল স্নোমোবাইলের ভেতর থেকে। মেঘলা আলোয় ছুরির ফলাটা কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করব। মনে পড়ে গেল, গত পরশুই আমি অদিতির সামনে স্পর্ধা দেখিয়ে বলেছি, '...আমি একা দুজনের চেয়েও একটু বেশি। এই কথাটা আমি অফিশিয়ালি সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই...।' এখন সেটা প্রমাণ করার সময় এসে গেছে। কিন্তু রহস্যটা তো এখনও আমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি। থিয়োরি একটা খাড়া করেছি বটে, কিন্তু তার জায়গায়-জায়গায় এখনও কিছু-কিছু ফাঁক থেকে গেছে। সেটা জানতে হলে অদিতির শাগরেদের পরিচয়টা আগে জানা দরকার।

তাই বললাম, 'যদি আইস অ্যাক্সটা না ফেলি?'

এ-কথা বলামাত্র যা ঘটে গেল তার জন্যে আমি তৈরি ছিলাম না।

অদিতিদের আশেপাশে বেশ কয়েকটা পেঙ্গুইন হাঁকডাক করতে-করতে ঘোরাফেরা করছিল। আচমকা তারই একটির গলা লক্ষ করে ছুরি

চালাল লোকটা। আর চোখের পলকে পেঙ্গুইনটার মাথা মাটিতে। বরফে রক্তারক্তি। রক্ত ছিটকে লাগল হতভাগ্য পেঙ্গুইনটার পাশে দাঁড়ানো এক নিরীহ জাতভাইয়ের বুকে। পেঙ্গুইনগুলো ডাকাডাকি বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। যেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শোকে ওরা নীরবতা পালন করছে। আর এই ধরনের মৃত্যুর সঙ্গে পাখিগুলো আদৌ পরিচিত নয় বলে খানিকটা যেন হতভম্বও হয়ে গেছে।

যেখানে সুন্দর তোমাকে আদর করে ঘিরে রাখে সেখানে হঠাৎই অসুন্দর থাবা বসালে তুমি আঘাত পাও সবচেয়ে বেশি, তাই না?

এই পাখিটার করুণ মৃত্যু আমাকে পাথর করে দিল। আইস অ্যাক্সটা অজান্তেই খসে পড়ল আমার হাত থেকে। আর একইসঙ্গে মনে পড়ে গেল উকিলসাহেবের কথা।

আমার মাথার মধ্যে যেন হাজার ওয়াটের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলে উঠল। সমস্ত হিসেব মিলে যেতে লাগল সহজ অঙ্কের মতো।

আমি পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম, 'পবন! এ তুমি কী করলে! তুমি পাগল হয়ে গেছ। য়ু হ্যাভ গন রেভিং ম্যাড, ম্যান।'

দাঁত বের করে হাসল পবন শর্মা। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'যাক, ফাইনালি আপনি চিনতে পারলেন তা হলে! চিফ, সরি ফর দ্য মিসচিফ— কিন্তু আইস অ্যাক্সটা ফেলতে আপনি এত দেরি করলেন কেন? আপনাকে ফোর্স করার এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। অপারেশান লেক এক্স-এর শুরু থেকেই অদিতি ছক কষছিল। শি ওয়ান্টেড টু বি রিয়েল ফেমাস। বুদ্ধি সবই ওর—আমি শুধু ওর প্ল্যানমতো কাজ করে গেছি। দ্য হোল প্ল্যান ওয়াজ সো থ্রিলিং!'

তা হলে ঠিক এইরকম করে শুরুতেই একটা পেঙ্গুইনকে খুন করেছে পবন শর্মা। সেই রক্ত ছিটকে লেগেছে উকিলসাহেবের বুকে। আমি সেটাকে মানুষের রক্ত ভেবেছি। অদিতি সেই রক্ত পরীক্ষা করে আমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে বলেছে, হ্যাঁ, ওটা মানুষেরই রক্ত।

কিন্তু বন্ধ ড্রিল-হাউস থেকে পবন শর্মা বাইরে বেরোল কেমন করে?

সে-কথা জিগ্যেস করতেই আবার হাসল পবন। ওর ডানহাতে ধরা ছুরিটা অলসভাবে ঝুলছে। হতভাগ্য পেঙ্গুইনটার রক্ত জমাট বেঁধে গেছে

বরফের ওপরে। টের পাচ্ছি, হাওয়ার জোর ক্রমশ বাড়ছে।

'চিফ, আপনার বোধহয় খেয়াল আছে, ড্রিল-হাউসের কাঠের তক্তাগুলো বাইরে থেকে আটকানো ছিল। তারই একটা খুলে আমি আলগা করে রেখেছিলাম। ঘটনার দিন ড্রিলটাকে অটোমেটিক মোডে চালিয়ে রেখে ভেতর থেকে চাপ দিয়ে তক্তাটা খুলে ফেলি। তার আগে অবশ্য তক্তাগুলোর জোড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিয়েছিলাম যে, বাইরেটা সুনসান আছে কি না। ব্যস, কাম ফতে। বাইরে বেরিয়ে তক্তাটাকে আবার ঠুকে জায়গামতো বসিয়ে দিয়েছি। ড্রিল-হাউসের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম আগেই। সো দ্যাট ক্রিয়েটেড দ্য ক্লোজ্‌ড রুম প্রবলেম। আপকা ইউনিক বন্ধ্ কম্‌রে কা মামলা। ইট ওয়াজ আ নাইস টাচ, ওয়াজ্‌ন্ট ইট?' দরাজ গলায় হা-হা করে হেসে উঠল পবন শর্মা। আমাকে বোকা ভাবতে ওর বেশ ভালো লাগছিল।

পেঙ্গুইনটার মৃতদেহ ঘিরে তখনও চার-পাঁচটা পেঙ্গুইন ঘোরাফেরা করছিল। মাঝে-মাঝেই মৃতদেহের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে কাছ থেকে নজর করে ওরা বুঝতে চাইছিল ওদের ভাইটি নড়াচড়া করছে না কেন।

শনশনে ঠান্ডা হাওয়া আমার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো দুই শত্রুর দিকে তাকিয়ে আমি শীত ভুলে যাচ্ছিলাম।

অদিতিকে আমার অপছন্দ হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু পবনকে দেখে গা ঘিনঘিন করছিল। যেন থালায় বেড়ে দেওয়া ভাতের ওপরে একতাল সাদাটে পোকা কিলবিল করছে। ওদের গায়ের লালা চকচক করছে, মিশে যাচ্ছে ভাতের সঙ্গে। এবং সেই ভাতের গ্রাস কেউ তুলে দিতে চাইছে আমার মুখে।

আমি বুঝতে পারছিলাম, গত পরশু সকালে সুরেন্দ্র নায়েককে ড্রিল-হাউসে পাঠানোর পর অদিতি কেন স্টার্ট-আপে ওকে সাহায্য করার ছুতোয় যেচে ড্রিল-হাউসে যেতে চেয়েছিল। সেখানে ও আর পবন মিলে, বলতে গেলে আমাদের নাকের ডগায়, সুরেন্দ্রকে খুন করেছে। তারপর আমাদের বোকা বানাতে অদিতি ড্রিল-হাউস ছেড়ে চলে এসেছে। আর অদিতি চলে আসার পর পবন ড্রিল স্টার্ট করে দিয়েছে। সেই শব্দ পেয়ে বাইরে থেকে আমরা ভেবেছি সুরেন্দ্র ড্রিল স্টার্ট করল।

সুরেন্দ্রর ভ্যানিশ হওয়ার ব্যাপারটা যে কোনও প্রাগৈতিহাসিক

সরীসৃপের কাণ্ড হতে পারে সে-ধারণা আমাদের মধ্যে চারিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল অদিতি। কারণ, ড্রিল-হাউস থেকে বেরিয়ে এসে ও বলেছিল, সুরেন্দ্র ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে—যেটা পুরোপুরি ওর বানানো। অথচ সুরেন্দ্র নায়েক তখন আর বেঁচে নেই। আর পবন শুরু থেকেই এমন একটা ভান করছিল যেন লেক এক্স-এর জলে ভয়ঙ্কর কোনও প্রাণী আছে, সেটা যে-কোনও সময় ড্রিলিং শ্যাফ্‌ট বেয়ে উঠে আসতে পারে। অভিনয়ের গুণে পবন ওর ভয়টা সংক্রামক ব্যাধির মতো অনেকের মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। আমাদের দলে সবচেয়ে ভিতু ছিল সুজাতা রায়। ও ভয়ে একেবারে হিস্টিরিক হয়ে উঠল। তখন এই কাল্পনিক ভয়কে কাজে লাগিয়ে পবন আর অদিতি 'হারাধনের দশটি ছেলে'-র খেলা শুরু করল।

পবন এবার পায়ে-পায়ে আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। রক্তমাখা ছুরিটা ওর হাতের মুঠোয় পেশাদারি ঢঙে ঝুলছে। খুব নরম গলায় ও বলল, 'ক্লোজ্‌ড রুম প্রবলেম তৈরি করার পর লুকিয়ে টয়লেটে গিয়ে একটা পেঙ্গুইনকে খতম করলাম। তার পাশে যে-পেঙ্গুইনটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটার বুকে রক্ত ছিটকে লাগল—ইয়োর ড্যাম পেট উকিলসাহেব—শালা লইয়ারকা বচ্চা! তারপর ওটার বডি চাপা দিয়ে দিলাম বরফের নিচে। কিছু ব্লাড স্পট নষ্ট করলাম না—আপনার জন্যে ক্লু হিসেবে রেখে দিলাম। আমরা জানতাম, যদি কখনও আপনি ওই ব্লাড টেস্ট করাতে চান তো আপনাকে অদিতির হেল্‌প নিতে হবে। কারণ, আমাদের দলে আর কেউ ব্লাড টেস্ট করতে জানে না—নট ইভ্‌ন সুজাতা। সুতরাং, সেদিক থেকে আমরা খুব সেফ ছিলাম।'

অদিতি গ্লাভ্‌সের পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, 'সূর্যদা, আমার প্ল্যানটা এখন নিশ্চয়ই আপনি মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন? পবন উধাও হওয়ার পর সবচেয়ে শক্ত কাজ ছিল ওকে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা। ও কখনও থাকত আমার তাঁবুতে, আর কখনও থাকত ড্রিল-হাউসে। বিশেষ করে ও রাতটা কাটাত ড্রিল-হাউসে। তা ছাড়া, মাত্র দু-তিনটে রাতের তো মামলা! আর আমি ওর খাবারটা দরকারমতো পৌঁছে দিতাম।'

আমার মনে পড়ে গেল ড্রিল-হাউসে কুড়িয়ে পাওয়া পাঁউরুটির

টুকরোগুলোর কথা। এ ছাড়া রোহিত যে স্টোর রুম থেকে শব্দ শুনেছে বলে বলছিল সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে বুঝতে হবে চুপিসারে অদিতি অথবা পবন ও-ঘর থেকে খাবার চুরি করছিল।

'সুরেন্দ্র, চন্দ্রেশ্বর, রোহিত—ওদের ডেডবডিগুলো কোথায় লুকিয়েছ?' আমি অদিতিকে জিগ্যেস করলাম। আর এগিয়ে আসা পবনের জন্যে মনে-মনে একটা উপায় খুঁজতে লাগলাম।

আমার বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। অভিযানের সাথী চার-চারজনকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে পবন আর অদিতির হাত কাঁপেনি। শুধু খ্যাতির লোভে ওরা সাইকোপ্যাথ হয়ে গেছে!

অদিতি আমার প্রশ্নের জবাব দিল, 'ওরা সবাই শুয়ে আছে বরফের নিচে। সুরেন্দ্রকে পবন ছুরি দিয়ে নিকেশ করেছে। রোহিত আর চন্দ্রেশ্বর চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে বিষ মেশানো ব্র্যান্ডি খেয়ে।'

পবন আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। ঠোঁট সামান্য ফাঁক করা—সামনের কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই খিকখিক করে হাসল ও। তারপর জাপানি সামুরাই যোদ্ধাদের অনুকরণে লম্বা ছুরিসমেত ডানহাতটা টান-টান করে বাড়িয়ে ধরল সামনে। ওর ছুরির ডগা আমার জ্যাকেট ছুঁয়ে ফেলল। কৃষ্ণা আর টুসকির কথা মনে পড়ল আমার। ওদের সঙ্গে আর কি দেখা হবে?

পবন বলল, 'ডেডবডিগুলো ক্যাম্পের আশপাশে যেখানে পোঁতা আছে সেগুলো আমরা একটা-একটা করে তুলে নিয়ে আসব। এনে পুঁতে দেব এখানে। আপনার আর সুজাতারটাও। তা হলে হেডকোয়ার্টার যদি পরে কোনও এনকোয়ারি করে কি ইনভেস্টিগেশান চালায় তো বডিগুলো আর খুঁজে পাবে না। সব ফুস!' বাঁহাত ঘুরিয়ে ম্যাজিশিয়ানের মতো একটা ভঙ্গি করল পবন। তারপর হাসল আবার।

'পবন, আমি তোমার বন্ধু। তোমার ভালো চাই। আমি রিপোর্টে সবকিছু টোন ডাউন করে তোমাদের ফেবারে লিখব—তাতে শাস্তি অনেক কম হবে। আমি...আমি...।'

'আপনি আমার কাছে এখন একটা পেঙ্গুইনের বেশি কিছু নন। ঠিক ওই পেঙ্গুইনটার মতন।' আঙুল তুলে মরা পেঙ্গুইনটার দিকে দেখাল পবন ঃ ধড় আর মাথা আলাদা হয়ে পড়ে আছে।

আমি ভয় পাওয়া কাতর গলায় বললাম, 'পবন, প্লিজ! আমি খ্যাতি চাই না, পুরস্কার চাই না...ফেমাস হতে চাই না! আমাকে মেরো না...প্লিজ!'

'কোথায় গেল সেই আয়রনম্যান সূর্যদ্যুতি সেন! আমাদের সিক্রেট এক্সপিডিশানের লিডার! আয়রনম্যান থেকে এখন সে স্পঞ্জম্যান হয়ে গেছে! ভয় বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস চিফ—বিশেষ করে মৃত্যুভয়...। চিফ, সরি ফর দ্য মিসচিফ!' পবনের হাতের ছুরি অল্প-অল্প দুলতে লাগল।

'পবন, প্লিজ! অদিতি...প্লিজ...!' আমি বড়-বড় শ্বাস টানতে গিয়ে হঠাৎই কাশতে শুরু করলাম। কাশতে-কাশতে আমার মুখ লাল হয়ে গেল, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। জ্যাকেটের ভেতর থেকে আমি স্টেইনলেস স্টিলের কনটেনারটা বের করে নিলাম। হাতের ইশারায় কোনওরকমে পবনকে থামতে বলে কনটেনারের ঢাকনা খুললাম। তারপর ওটা মুখের কাছে নিলাম চুমুক দেওয়ার জন্যে।

আমার অভিনয়ে পবন ঠকে গেল। ভাবল, জীবন ভিক্ষে চাওয়া, কাকুতি-মিনতি করা, মেরুদাঁড়াহীন একটা প্রাণী ওর সামনে ধ্বংসস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অসহায় অবস্থায় ব্র্যান্ডি বা ওইজাতীয় কিছু খেতে চাইছে।

তাই ও বলল, 'য়ু আর গ্রেট, চিফ। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা বের করেন।'

ঠান্ডা হাওয়ার বেগ শনশন করে বাড়ছিল। যে-ক'টা পেঙ্গুইন আমাদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল সেগুলো ঢাল বেয়ে চলে যেতে লাগল নিচে হ্রদের দিকে।

আমি কনটেনারটা পবনের দিকে বাড়িয়ে ধরে ওর দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেলাম।

আমরা এখন প্রায় মুখোমুখি। ওকে বললাম, 'তুমি একচুমুক খেতে পারো...কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ...।'

আমার কাতর অবস্থা দেখে পবন হাসল।

আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আজ উষ্ণতা বড়জোর মাইনাস বত্তিরিশ কি তেত্তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর কন্‌সেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিডের হিমাঙ্ক মাইনাস ৪১.৬ ডিগ্রি। সুতরাং অ্যাসিডটা জমে হিম হয়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। বরং এই ঠান্ডায় অ্যাসিডের কোনও ভেপার তৈরি

হবে না—ধোঁয়ার মতো সেটা দেখাও যাবে না কনটেনারের মুখ দিয়ে। ফলে পবন বুঝতে পারবে না আমি ওর মুখে কী ছুড়ে দিতে চলেছি।

না, বুঝতে পারল না।

বুঝতে পারল যখন, তখন দেরি হয়ে গেছে। ওর মুখ, গগল্‌স আর জ্যাকেট ভয়ঙ্কর অ্যাসিড একেবারে শেষ করে দিল। ছুরিটা খসে পড়ল ওর হাত থেকে। দু-হাতে মুখ চেপে ধরে ও পড়ে গেল বরফের ওপরে। কসাইখানার মৃত্যুপথযাত্রী শুয়োরের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

হতবাক অদিতি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে—যেন সিনেমার রোমাঞ্চকর শেষ দৃশ্য দেখছে।

কিন্তু দৃশ্যটা আমি আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে চাই। আমি গ্রুপ লিডার। আমিই সবসময় শেষ কথা বলব। পবন শর্মা বা রাবণ শর্মা নয়।

তাই কনটেনারটা ফেলে দিয়ে পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আইস অ্যাক্সটা তুলে নিলাম। কৃষ্ণা আর টুসকির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। টুসকিকে কোলে নিয়ে চুমো খেতে চাই। বারবার, অনেকবার। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। কোনও শুয়োরের বাচ্চা আমাকে রুখতে পারবে না।

হিংস্র জন্তুর মতো একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে। এবং একইসঙ্গে ভয়ঙ্কর শক্তিতে আইস অ্যাক্স গেঁথে দিলাম পবনের কোমরে।

ওর জ্যাকেট, পোশাক, চামড়া, মাংস—সব স্তর ভেদ করে আইস অ্যাক্সের ধারালো ফলা বোধহয় হাড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল।

পবন একটা যন্ত্রণার চিৎকার নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তাই আইস অ্যাক্সের আঘাতের জন্যে আলাদা করে চিৎকার করতে পারল না। চিৎকারটা একটু জোরালো হল শুধু।

ও আর অদিতি বোধহয় এখন বুঝতে পারছে, আমি দুজনের চেয়েও একটু বেশি।

আইস অ্যাক্সটা পবনের শরীরে গেঁথে গিয়েছিল। তাই ওটা টানাটানি না করে পবনের ফেলে দেওয়া ছুরিটা তুলে নিলাম।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে তুষারঝড় শুরু হয়ে গেল।

শুকনো বরফকুচি অল্প-অল্প উড়ছিল একটু আগে থেকেই। এখন সেটা বাড়তে শুরু করল।

এতক্ষণ পর অদিতি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কান্না তো নয়, যেন কোনও পাগলের সব হারানোর হাহাকার।

'প—ব—ন!'

অদিতির ডাকটা এমন বুকফাটা যে, মৃত মানুষও জেগে উঠতে চাইবে। কিন্তু পবন উঠল না। আমি জানি, আর কোনওদিন উঠবে না। কারণ, ওর কাতরানি বন্ধ হয়ে গেছে।

পবন ওর কতটা বন্ধু ছিল? কত কাছাকাছি ছিল?

অদিতির দিকে দু-পা এগোতেই ও হিস্টিরিয়া-রুগির মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল : 'খবরদার! আমার দিকে এগোবেন না।'

বরফ উড়ছিল। শীতও আমাদের নিয়ে এবার ছেলেখেলা করতে শুরু করেছে। আশেপাশে পেঙ্গুইন আর একটাও নেই। এখন বড় ভয়ের সময়। এখানে আর থাকাটা ভালো হবে না। আন্টার্কটিকার ঠান্ডা কারও কথা শোনে না। নিজের খুশিমতো কাজ করে।

আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললাম, 'অদিতি! আমি তোমার ভালো চাই। আমাকে ভুল বুঝো না। এর মধ্যেই অনেক ভুল হয়ে গেছে। প্লিজ! চলো, আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই। সেখানে ঠান্ডা মাথায় বসে কথা হবে।'

অদিতি এবার পাগলের মতো কাজ করে বসল। একলাফে উঠে পড়ল ওর স্নোমোবাইলে। গাড়ি স্টার্ট করে ছুটিয়ে দিল। চাপা গর্জন তুলে সাদা বরফের কুচির আড়ালে ওর গাড়িটা হারিয়ে গেল।

কিন্তু এই ব্লিজার্ডের মধ্যে ও কোথায় যাবে?

একজন জীবিত ও একজন মৃত রওনা হয়ে গেল দিকশূন্যপুরের দিকে। যখন ওদের আবার খুঁজে পাওয়া যাবে তখন সুজাতা আর ও একই জায়গায় চলে গেছে। আন্টার্কটিকায় যারা হারিয়ে যায় তারা একেবারে হারিয়ে যায়। তাদের আর ফেরানো যায় না।

আমি বোকার মতো ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। 'হারাধনের দশটি ছেলে'-র গল্প এখন শেষ। এখন কোন বনে আমি যাব? এখানে এসেছিলাম সাতজন। তারপর কী যে এক বিয়োগের অঙ্ক শুরু হয়ে গেল! শেষ পর্যন্ত

হাতে রইল এক। আমি। এবং একা।

ছুরিটা ফেলে দিলাম। হাত তুলে তুষারঝড় আড়াল করে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেলাম স্নোমোবাইলের কাছে। যেভাবে হোক ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে। যেতেই হবে। তারপর রেডিয়ো মেসেজ পাঠাতে হবে বেস ক্যাম্পে। ওখানে ব্লিজার্ড এখন থেমেছে কিনা কে জানে। ওরা কি প্লেন পাঠাতে পারবে?

পারুক বা না পারুক আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আর রিপোর্ট লিখতে হবে।

লিখতে হবে 'হারাধনের সাতটি ছেলে'-র কাহিনি।

